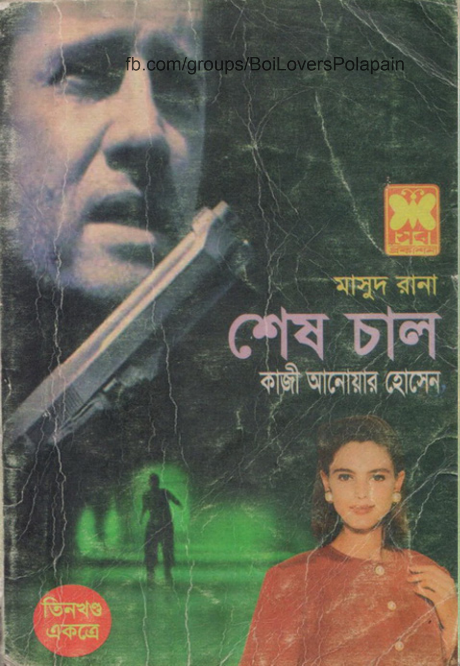


মাসুদ রানা

(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানা তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানডেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমা ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকা সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শেষ চাল-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯

এক

দরজার সীল ভাঙা বিশাল একটা কাজ, এবং সময় সাপেক্ষ, অথচ বর্ষা শুরু হবা আগে হাতে অল্প যে সময় আছে তা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। দরজা ভেঙে সমাধি ভেতর ঢোকার প্রস্তুতি নিতে মূল্যবান একটা দিন বেরিয়ে গেল। স্বভাবতই সমা এলাকার নিরাপত্তা বিধান রানার প্রথম উদ্বেগ। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতু মুখে শাফিকে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করতে বলল ও, এই সীমা রেখার সামনে বাড়া নিষিদ্ধ করা হলো। সেতু পেরুতে পারবে সব মিলিয়ে মাত্র নয়জন–রানা নিমা, মারটিন, শাফি, রুবি আর চারজন সন্ন্যাসী।

লোয়ার টানেল পরিষ্কার করার কাজে টোরা নাবু বারবার নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে, ফলে আগেই তাকে প্রধান সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছে রানা। সিদ্ধান্ত হলো, এখন থেকে যা কিছু আবিষ্কার করা হবে প্রতিটির রেকর্ড রাখা চাই। তেপায়া ও স্পেয়ার ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট নিয়ে হাজির হলো নাবু, অ্যাপ্রোচ টানেল আর সীল করা দরজার ফটো তুলল রানা। ফটো তোলার কাজ শেষ হতে দরজা ভাঙার টুলস নিয়ে আসার জন্যে নাবুকে অনুমতি দিল ও।

সিঙ্ক-হোল পর্যন্ত সরিয়ে আনা হয়েছে জেনারেটর, ফ্লাডলাইট জ্বেলে সিঁড়ি ওপরের ল্যান্ডিং আর দরজাটা আলোকিত করার ব্যবস্থা হলো। চৌকো আকৃতির প্লাস্টার যে-টুকু কাটা হবে তা চিহ্নিত করে নিয়েছে রানা, তার আগে টাইটার সতর্কবাণীর অনুবাদ শুনিয়ে দিয়েছে মারটিন, শাফি আর রুবিকে। কেউই ওর ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেয়নি।

দরজার গা থেকে দুটো সীলই অক্ষত অবস্থায় তুলে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথমে প্রোব হিসেবে বড় সূচ ব্যবহার করা হলো। প্লাস্টারের নিচে কি আছে সেটা জানাই উদ্দেশ্য। একটু পরই জানা গেল প্লাস্টারের নিচে রয়েছে নল-খাগড়ার ছিলকা দিয়ে নিখুঁতভাবে বোনা কয়েকটা স্তর। নিমা বলল, 'ওই বুননই প্লাস্টারকে খসে পড়তে দেয়নি।' লম্বা সুচটা গায়ের জোরে আরও ভেতরে ঢোকাল রানা, এক পর্যায়ে ওটা আর ঠেকল না কোথাও, অপর দিক বেরিয়ে গেছে ডগা। 'দরজার কবাট ছ'ইঞ্চি চওড়া,' জানাল রানা। চার কোণে চারটে খুদে ফুটো তৈরি করা হলো। সরে এসে নাবুকে জায়গা ছেড়ে দিল ও, তুরপুন দিয়ে ফুটোগুলোকে বড় করার কাজে হাত দিল সে।

গর্তগুলো বড় হবার পর নাবুকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখার নেই। তবে প্রাচীন বদ্ধ বাতাস লাগল মুখে। গন্ধটা শুকনো আর উগ্র। 'আলোটা দাও!' মারটিনকে বলল ও। মারটিন ওর হাতে ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিল।

'কি দেখছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল নিমা। 'বলুন আমাকে!'

'রঙ!' ফিসফিস করল রানা। 'চোখ ধাঁধানো বিচিত্র সব রঙের বাহার!' সরে এসে কোমর ধরে নিমাকে উঁচু করল ও। ফাঁকটায় চোখ রাখল নিমা।

'কি সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'ও গড, কী সুন্দর!'

হেভী-ডিউটি ইলেকট্রিক ব্লোয়ার ফ্যান চালু করা হলো, শ্যাফটের বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার সময় নিমা ছাড়া আর কাউকে থাকতে দেবে না রানা, সবাইকে পাঠিয়ে দিল ভাসমান সেতুর কাছে। ওর হাতে একটা চেইন-স রয়েছে। দু'জনেই মাস্ক আর গগলস পরে নিল।

তুরপুন দিয়ে বড় করা ফুটো থেকে চেইন-শ কাজ শুরু করল, প্লাস্টার ও নিচের ছিলকার বুনন নরম কেকের মত কেটে ফেলছে। চৌকো ফাঁকটা তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগল না। জোড়া সীল সহ প্লাস্টারের চারকোনা টুকরোটা সাবধানে কবাট থেকে আলাদা করে নিল ওরা। এবার ফাঁকের ভেতর ফ্লাডলাইটের আলো ফেলল রানা। ভেতরে এখন ধুলোর মেঘ তৈরি হয়েছে, কিছুই দেখা গেল না। হ্যাচ গলে ভেতরে ঢুকল রানা, তারপর নিমাকে ঢুকতে সাহায্য করল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন, ব্লোয়ার ফ্যান ধুলোর মেঘ সরিয়ে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল ধুলো, তারপর প্রথমেই ওদের চোখ পড়ল পায়ের নিচে মেঝের ওপর। মেঝে এখানে পাথরের ফলক দিয়ে তৈরি নয়, হলুদ আকীক পাথরের টাইল দিয়ে মোড়া, পালিশ করা চকচকে, আর এমন কৌশলে জোড়া লাগানো যে জয়েন্টগুলো দেখা যায় না। স্বচ্ছ ও অবিচ্ছিন্ন কাচের একটা চাদর বলে মনে হয়, ম্লান দেখাচ্ছে শুধু যেখানে মিহি ধুলো জমেছে। ওদের পা লেগে ধুলো যেখানে সরে গেছে, ফ্লাডলাইটের আলো পড়ায় ঝলমল করছে আকীক। ওদেরকে ঘিরে থাকা ধুলো আরও পাতলা হয়ে এল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটছে বিচিত্র বর্ণ আর আকৃতি। মাস্ক খুলে আকীক মেঝেতে ফেলে দিল নিমা। রানাও তাই করল। প্রাচীন, অস্বাস্থ্যকর বাতাসে শ্বাস নিল ওরা। বাতাস এখানে কয়েক হাজার বছর আটকে আছে। ছাতা ধরা গন্ধ, লিনেন ব্যান্ডেজ আর সুবাসিত লাশের ঘ্রাণ পেল ওরা।

ধুলো পুরোপুরি সরে যেতে লম্বা ও সোজা একটা প্যাসেজওয়ে দেখতে পেল ওরা, শেষ প্রান্তটা ছায়া আর অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। হ্যাচ দিয়ে গলিয়ে স্ট্যান্ড সহ ফ্লাডলাইটটা ভেতরে নিয়ে এল রানা। প্যাসেজটার পুরো দৈর্ঘ্য এবার আলোকিত হয়ে উঠল।

পাশাপাশি এগোচ্ছে ওরা, প্রাচীন দেবতাদের ছায়া ও মূর্তি চারদিক থেকে ঝুঁকে রয়েছে ওদের ওপর। দেয়াল থেকে চোখ রাঙাচ্ছেন তাঁরা, বিশাল চোখে আক্রোশ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন সিলিং থেকে। নিমাকে নিয়ে ধীর পায়ে এগোচ্ছে রানা। আকীক টাইলের ওপর ধুলো জমে থাকায় পা ফেলায় কোন শব্দ হচ্ছে না। বাতাসে ভেসে থাকা ধুলো আলোকিত জালের মত লাগছে, পরিবেশে এনে দিয়েছে অলৌকিক স্বপ্নরাজ্যের ভাব। প্রতি ইঞ্চি দেয়ালে আর ছাদে লিপি বা নকশা দেখা যাচ্ছে–সবই দীর্ঘ উদ্ধৃতি, বুক অব ব্রিদিংস, বুক অব দা পাইলনস ও

বুক অব উইজডম থেকে নেয়া। অন্যান্য হায়ারোগ্লিফিক্স ফুটিয়ে তুলেছে মর্ত্যলোকে ফারাও মামোসের অস্তিত্বের ইতিহাস, সদগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যে-কারণে দেবতাদের ভালবাসা পেয়েছিলেন তিনি।

আরও খানিক সামনে লম্বা ফিউনারাল গ্যালারি দেখতে পেল ওরা, আটটা শ্রাইন-এর প্রথমটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্রাইন হলো লাশের দেহাবশেষ বা জীবিতকালে তাঁর ব্যবহার করা জিনিস-পত্র স্মৃতি হিসেবে রাখার বাক্স। প্রথমটা অসিরিস-এর শ্রাইন। বৃত্তাকার একটা চেম্বার, দেয়ালে ঈশ্বরের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা, কুলুঙ্গিতে অসিরিস-এর খুদে মূর্তি, চোখগুলো আকীক মণি আর স্ফটিক পাথর দিয়ে তৈরি, এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যে চোখাচোখি হতেই শিউরে উঠল নিমা। হাত বাড়িয়ে দেবতার গোড়ালি ছুঁলো রানা, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'সোনা।'

তারপর মুখ তুলে তাকাল টাওয়ারের মত উঁচু দেয়ালচিত্রের দিকে, শ্রাইনের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, উঠে গেছে গম্বুজ আকৃতির ছাদে। পাতালরাজ্যের অধিপতি পিতা অসিরিস-এর আরেকটা দৈত্যাকার ফিগার, মুখটা সবুজ, নকল দাড়ি, বাহু জোড়া বুকে ভাঁজ করা, হাতে বাঁকা লাঠি, মাথায় লম্বা হেড-ড্রেস বা মুকুট, মুকুটের কপালে ফণা তোলা গোক্ষুর। সচল ধুলোর মধ্যে দেবতাকে জ্যান্ত মনে হলো, ওদের চোখের সামনে যেন নড়াচড়া করছেন।

প্রথম শ্রাইনের সামনে বেশিক্ষণ থামল না ওরা। গ্যালারিটা তীরের মত লম্বা হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী শ্রাইন দেবীর প্রতি উৎসর্গিত। কুলুঙ্গিতে বসে আছেন আইসিস, বসে আছেন সিংহাসনে. এই সিংহাসনই তাঁর প্রতীক চিহ্ন। শিশু হোরাস স্তন পান করছেন। দেবীর চোখ আইভরি আর নীল ল্যাপিস ল্যাজুলাই।

কুলুঙ্গির চারপাশ দখল করে আছে দেয়ালচিত্র, শিল্পীর আঁকা তাঁরই ছবি। এখানে জননী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে তাঁকে, সুর্মা টানা কালো রাত্রির মত চোখ, মাথায় সান ডিস্ক আর পবিত্র গরুর শিং। তাঁর চারপাশের দেয়াল হায়ারোগ্লিফিক্স সঙ্কেত, এত উজ্জ্বল যে জোনাকি পোকার মত জ্বলছে। একশো নাম তাঁর, কখনও অ্যাসট তিনি, কখনও নেট বা বাস্ট। পটাহ, সৌকের, রেনাট নামেও ডাকা হয় তাঁকে। প্রতিটি নাম একেকটা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

পরবর্তী শ্রাইনে রয়েছে হোরাস-এর মূর্তি, এ-ও সোনার তৈরি, মাথাটা বাজপাখির। ডান হাতে ধনুক, বাঁ হাতে ইংরেজি হরফ টি আকৃতির ক্রস। জীবন-মৃত্যুর দেবতা তিনি। তাঁর চোখ লাল রত্ন। মূর্তির চারপাশে তাঁরই বিভিন্ন বয়েসের দেয়ালচিত্র। শিশু হোরাস আইসিস-এর স্তন পান করছেন। তরুণ হোরাস ঋজু ও গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর, বাজপাখির মুখ নিয়ে অন্য এক রূপে হোরাস, শরীরটা কখনও সিংহের, আবার কখনও বীরযোদ্ধার, মাথায় মুকুট। তাঁর নিচে হায়ারোগ্লিফিক্স–'মহান দেবতা এবং স্বর্গের প্রভু, বহু গুণের অধিকারী, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিধর, যে শক্তি তাঁর স্বর্গীয় পিতা অসিরিস-এর শত্রুকে পরাভূত করেছিল।'

চার নম্বর শ্রাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সেথ, শয়তান, ধ্বংস আর যুদ্ধের দেবতা।

তাঁরও শরীর সোনার তৈরি, তবে মাথাটা কালো হায়েনার।

পঞ্চম শ্রাইনে রয়েছেন লাশ আর কবরের দেবতা, আনুবিস, মাথাটা শিয়ালের। লাশের দেখাশোনা করেন তিনি, বিশাল দাঁড়ি-পাল্লায় হৃৎপিণ্ড ওজন করার সময় নিক্তির কাঁটা পরীক্ষা করেন। পাল্লা দুটো যদি সমান সমান হয়, মৃত ব্যক্তির গুরুত্ব ও মূল্য আছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়, কিন্তু যদি একদিকের পাল্লা তার বিরুদ্ধে এক চুলও নিচে নেমে থাকে, আনুবিস তার হৃদয় দৈত্যাকার কুমীরকে খেতে দেন।

তারপর থোত-এর শ্রাইন। ইনি ভাষা বা লিখন-এর দেবতা, মাথাটা পবিত্র সারসজাতীয় পাখির, হাতে কলম। সপ্তম শ্রাইনে চার পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন পবিত্র গাভী হাথোর, গায়ের রঙ সাদা ও কালো, মুখটা মানুষের মত, তবে কান দুটো ট্রাম্পেট আকৃতির। অষ্টম শ্রাইন আকারে সবচেয়ে বড়, দেখতেও সবগুলোর চেয়ে সুন্দর। এটা আমোন-রা-র শ্রাইন, তিনি সমস্ত সৃষ্টির জনক। তিনি সূর্য: প্রকাণ্ড সোনার বৃত্ত, সোনালি রশ্মি ছড়াচ্ছেন।

এখানে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। আটটা পবিত্র শ্রাইন ট্রেজার হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ, এরকম মূল্যবান প্রত্ন নিদর্শন এর আগে আবিষ্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। টাকার অঙ্কে এগুলোর কি দাম হতে পারে ভাবতে গিয়ে চিন্তাশক্তি লোপ পাবার অবস্থা হলো ওর। ওজন দরে সোনা বিক্রি করলে কি দাম পাওয়া যাবে সেটা বের করা সহজ কাজ, কিন্তু প্রাচীন এই শিল্পকর্মের মূল্য তার চেয়ে শত বা সহস্র গুণ বেশি হবে। তাছাড়া, সবে মাত্র শুরু, ট্রেজারের কয়েকটা মাত্র নমুনা দেখতে পেয়েছে ওরা। না জানি সামনে আর কত কি আছে!

চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিয়ে প্যাসেজের শেষ মাথায় বিশাল চেম্বারের দিকে ঘুরল রানা।

'সমাধি,' ফিসফিস করল নিমা।

ওরা সামনে বাড়ছে, সেই সঙ্গে পিছিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। এখন ওরা সমাধির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে। ওটার দেয়ালও চিত্রশোভিত, প্রতিটি বিচিত্র বর্ণ থেকে যেন আগুনের মত আভা ফুটে বেরুচ্ছে। দীর্ঘ এক মানুষের ছবি দেয়াল ধরে সিলিং পর্যন্ত পৌঁচেছে। ওটা দেবী নাট-এর নমনীয়, সর্পিল দেহ, সূর্যের জন্ম দিচ্ছেন। তাঁর খোলা জরায়ু থেকে সোনালি কিরণ বেরুচ্ছে, ফারাও-এর অলঙ্কৃত পাথুরে শবাধারকে আলোকিত করেছে, মৃত রাজাকে দান করছে নতুন জীবন।

চেম্বারের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে রাজকীয় শবাধার, বিশাল এক কফিন, প্রকাণ্ড এক নিরেট গ্র্যানিট থেকে কেটে বের করা। এত বড় আর অসম্ভব ভারী কফিনটা জলমগ্ন টানেল দিয়ে বয়ে আনতে কতজন ক্রীতদাস লেগেছে, ভাবতে গিয়ে তাজ্জব বনে গেল রানা।

তারপর কফিনের ভেতর তাকাল ও, আর তাকিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। শবাধারটা খালি। প্রকাণ্ড গ্র্যানিট ঢাকনি তুলে ফেলা হয়েছে, তুলে এমনভাবে এক পাশে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে যে পুরোটা প্রস্থ জুড়ে ফাটল ধরেছে ওটায়, এই মুহূর্তে দু'ভাগ হয়ে পড়ে রয়েছে কফিনের পাশের মেঝেতে।

ধীর পায়ে সামনে বাড়ল ওরা, হতাশার তিক্ত স্বাদের সঙ্গে ধুলো মিশছে

জিভে। একেবারে কাছে এসে কফিনের ভেতর চারটে জার-এর ভাঙা টুকরো দেখল ওরা। পাত্রগুলো তৈলস্ফটিক দিয়ে তৈরি, রাজার নাড়িভুঁড়ি, লিভার ও শরীরের অন্যান্য ভেতরকার অঙ্গ রাখার জন্যে। ভাঙা ঢাকনিতে দেবতা আর অবাস্তব প্রাণীদের মাথা অলঙ্করণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

'ফাঁকা!' ফিসফিস করল নিমা। 'রাজার লাশ গায়েব হয়ে গেছে।'

দেয়ালচিত্রের ফটো তুলতে কয়েকটা দিন ব্যয় হলো। দেবতা ও দেবীদের স্ট্যাচুও বাক্স বন্দী করা হলো এই সময়। কাজের ফাঁকে খালি শবাধার নিয়ে আলোচনা করল রানা ও নিমা। নিমা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সমাধির গেটের সীল তো ভাঙা হয়নি।

'ব্যাখ্যা একটা না থেকে পারে না,' বলল রানা। 'টাইটা নিজেই হয়তো লাশ আর ট্রেজার সরিয়ে ফেলে। স্ক্রোলে বারবার সে বলতে চেয়েছে বিপুল ধন-সম্পদ এভাবে লুকিয়ে রাখার কোনই মানে হয় না, তারচেয়ে জাতি আর জনগণকে পুষ্টি যোগানোর কাজেই ব্যবহার করা উচিত।'

নিমার তর্ক হলো, নদীতে বাঁধ দিয়ে, পুলের নিচে টানেল তৈরি করে লাশ আর ট্রেজার এখানে এনেছে টাইটা, বিশাল এক সমাধি তৈরি করেছে, তারপর রাজার মমি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে ফেলে, এটা মেনে নেয়া যায় না। 'টাইটা সবসময় যুক্তিতে বিশ্বাসী। মিশরীয় দেবতাদের শ্রদ্ধা করত সে। তার সব লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি বা ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিল সে, কাজেই এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব হতে পারে না। রাজকীয় মমির অন্তর্ধান আমার কাছে বিরাট একটা রহস্য, রানা। এখানে কি যেন একটা গোলমাল আছে। এমন কি পেইন্টিং আর দেয়ালের শিলালিপিও কেমন যেন বেমানান লাগছে।'

'কেন, অলঙ্করণ আপনার বেমানান লাগবে কেন?'

'প্রথমে পেইন্টিংগুলোর কথাই ধরুন,' বলল নিমা, হাত তুলে আইসিসের ছবি দেখাল। ছবিটায় আইসিস তাঁর একটা হাত নাড়ছেন। 'সুন্দর ছবি, যোগ্য কোন ক্লাসিক্যাল শিল্পীরই আঁকা। তবু গতানুগতিক ভাবটুকু স্পষ্ট, ফর্ম আর রঙের ব্যবহারে পুরানো একটা ধারা ব্যবহার করা হয়েছে। ফিগারগুলো আড়ষ্ট, তারা নাচছে না। মেধা আর প্রতিভার ছোঁয়া অনুপস্থিত, রানী লসট্রিস-এর সমাধিতে যা আমরা চাক্ষুষ করেছি,' স্ফটিকের জারে মূল স্ক্রোল যেখানে লুকানো ছিল।'

দেয়ালচিত্রের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর নিমার সঙ্গে একমত হলো রানা। 'হ্যাঁ, ট্যানাস-এর সমাধিতে যে দেয়ালচিত্র দেখেছি, সেগুলোর সঙ্গে এগুলো মেলে না।'

'বুঝুন তাহলে! ওগুলো টাইটার নিজের আঁকা ছিল। এগুলো তা নয়। এগুলো তার অধস্তন কোনও শিল্পীর আঁকা।'

'শিলালিপি সম্পর্কে আপনার অভিযোগ কি শোনা যাক,' বলল রানা।

'এমন কোন সমাধির কথা শুনেছেন, যেটার দেয়ালে বুক অব দ্য ডেড-এর উদ্ধৃতি নেই? কিংবা খোদাই করা পাথরে ব্যাখ্যা করা হয়নি কিভাবে সাতটা তোরণ পেরিয়ে স্বর্গে পৌছুতে হয়?'

হতচকিত দেখাল রানাকে। এই ব্যাপারটা ভেবে দেখেনি ও। আপাতত আলোচনা থামিয়ে পবিত্র স্ট্যাচুগুলোর প্যাকিং করার কাজ কতটুকু এগোল দেখতে চলে এল গ্যালারির শেষ মাথায়। ইংল্যান্ড ত্যাগ করার আগেই একটা ব্যাপার নিশ্চিত করেছিল রানা, মূল্যবান ও ভঙ্গুর ইকুইপমেন্ট প্লেনে করে গিরিখাদে পৌছুনো হবে মেটাল অ্যামুনিশনের বাক্সে ভরে। এই বাক্স বা ক্রেট ওয়াটারপ্রুফ রাবার সীল দিয়ে মোড়া, ভেতরে নরম প্যাড লাগানো আছে। ওই ক্রেট সযত্নে রেখে দেয়া হয়েছিল, সমাধির ভেতর ট্রেজার পাওয়া গেলে কাজে লাগবে ভেবে। দু'টা স্ট্যাচু ক্রেটে ভালভাবেই ঢুকল, কিন্তু শয়তান সেথ আর গাভী হাথোর-এর মূর্তি আকারে এত বড় যে ঢোকানো গেল না। তারপর রানা আবিষ্কার করল, এই মূর্তি দুটো কয়েক ভাগে বিভক্ত–মাথা আলাদা করা যায়, আলাদা করা যায় গাভীর চারটে পাও। এরপর আর ওগুলোকে ক্রেটে ভরতে কোন অসুবিধে হলো না।

টোরা নাবু প্যাকিং-এর দায়িত্বে রয়েছে। তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিমার কাছে আবার ফিরে এল রানা। ওকে দেখেই নিমা বলল, 'রানা, শিলালিপি নিয়ে কাজ করার জন্যে আমাকে আপনি কতটা সময় দিতে পারেন?'

'খুব বেশি হলে এক কি দু'হপ্তা,' বলল রানা। ইস্কান্দার গাউসের সঙ্গে কথা বলে দেখা করার একটা দিন-তারিখ ঠিক করে নেব আমি। সেই তারিখে রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌছুবেন তিনি, ওখানে তখন আমাদেরকে থাকতেই হবে।'

'এখান থেকে আপনি ইস্কান্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিভাবে?'

'ডেবরা মারিয়ামে একটা পাবলিক টেলিফোন আছে, পোস্ট অফিসে,' বলল রানা। 'রুবি তো গোজামের যে-কোন জায়গায় অনায়াসে ঘোরাফেরা করতে পারে। একদল সন্ন্যাসী থাকবে এসকর্ট হিসেবে, এসকার্পমেন্টে উঠে ব্রিটিশ এমব্যাসীর ব্যারি গরডনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে রুবি, গরডন মেসেজটা পৌছে দেবে ইস্কান্দারের কাছে।'

'কবে যাবে রুবি?'

'শাফি বলেছে, কাল। মাল্টা থেকে প্লেন নিয়ে রওনা হবার জন্যে গাউসকে সময় দেয়া দরকার,' বলল রানা। 'টাইমিংটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পৌছুলাম, কিন্তু প্লেন পৌছুতে দেরি হলো, কিংবা প্লেন পৌছুল, আমরা পৌছুতে দেরি করলাম–এরকম হলে বিপদ ঘটতে পারে।'

'পয়লা এপ্রিল ভোরবেলা,' রুবিকে মেসেজটা দিল রানা। 'ইস্কান্দারকে তুমি বলবে, এপ্রিল ফুলস' ডে-র ভোরবেলা ওঁকে পৌছুতে হবে রঁদেভোয়। তারিখটা মনে রাখতে সুবিধে হবে।'

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তখুনি রওনা হয়ে গেল রুবি। বেশ খানিক দূর চলে গেছে সে, হঠাৎ নিমা বলল, 'ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে!' ছুটল ও। 'এই রুবি! রুবি, দাঁড়াও!'

আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের ঘনঘটা দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রুবি, হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে পৌছুল নিমা। ওরা দু'জন

কথা বলছে, আবার এসকার্পমেন্টের ওপর আকাশের দিকে তাকাল রানা, ভাবছে সময়ের আগেই না বর্ষা শুরু হয়ে যায়। তারপর আবার যখন ওদের দিকে তাকাল, দেখল রুবির হাতে কি যেন একটা গুঁজে দিল নিমা। শার্টের পকেটে সেটা গুঁজে মাথা ঝাঁকাল রুবি, তারপর আবার সন্ন্যাসীদের পিছু নিয়ে রওনা হয়ে গেল। নিমা ফিরে আসতে রানা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, নিমা?'

'মেয়েদের অনেক গোপন ব্যাপার থাকে,' জবাব দিল নিমা। 'সব কথা জিজ্ঞেস করতে হয় না।' তারপর হেসে উঠে বলল, 'গরডনের মাধ্যমে মামিকে একটা মেসেজ পাঠাতে বললাম রুবিকে, জানাতে চাই আমি ভাল আছি।'

উত্তরটা রানাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। মায়ের ফোন নম্বর রুবিকে দেয়ার জন্যে আগেই একটা কাগজে লিখে রেখেছিল নিমা? তাহলে সবার সামনে কেন রুবিকে দিল না? ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল রানা, রুবি ফিরে এলে আসল ব্যাপার জেনে নেবে ও।

টানেলের ভেতর সিঁড়িটার গোড়ায় ওঅর্কশপ তৈরি করেছে ওরা। টোরা নাবু একটা টেবিল বানিয়ে দিয়েছে, তাতে নিমার ড্রইং, বই, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি ছড়ানো। মারটিন একটা ফ্লাড-লাইটেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পাশের দেয়ালে আটটা ক্রেটে রয়েছে দেব-দেবীদের মূর্তি। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুতে কমান্ডার শাফির সশস্ত্র গেরিলারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে। টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে নিমাকে— ফটোগ্রাফ পরীক্ষা, দেয়ালচিত্রের মাপজোক, শিলালিপির অনুবাদ, কাজের কোন শেষ নেই। কোন কোন দিন একটানা পনেরো ঘণ্টাও কাজ করে। এক পর্যায়ে রেগে যায় রানা, হুকুমের সুরে ঘুমাতে যেতে বলে।

আজও ঠিক তাই ঘটল। ধমক খেয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে চওড়া কার্নিসে চলে এল নিমা, এখানেই ওদের ক্যাম্প ফেলা হয়েছে। মশারি আগেই টাঙানো হয়েছে, ভেতরে ঢুকে স্লীপিং ব্যাগে আশ্রয় নিল। একটু দূরে রানাও শুলো।

মাত্র তিন ঘণ্টা পর সকাল হয়ে গেল। ঘুম ভাঙার পর নিমাকে ওর মশারির ভেতর দেখতে পেল না রানা। দ্রুত দাড়ি কামাল ও। মাখন, রুটি আর সেদ্ধ ডিম খেলো। হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে টানেলে ঢুকল, সেতু পেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় উঠে এল। গ্যালারিতে পৌছে দেখল অসিরিস-এর খালি শ্রাইনের সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে কি যেন দেখছে নিমা। বাম হাতের গরম কাপটা ওর বাহুতে ঠেকাতে চমকে উঠল ও। রেগে গিয়ে বলল, 'আমাকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন!'

'কি দেখছেন?' জানতে চাইল রানা, নিমার বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল কাপটা। 'কি আবিষ্কার করলেন?'

'বলতে হলে দেখাতে হবে,' জবাব দিল নিমা। 'আসুন আমার সঙ্গে।' রানাকে নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায়, নিজের ওঅর্কশপে নেমে এল ও। 'কয়েকদিন ধরে আমি শুধু ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলকের এক পাশের লিপি অনুবাদ করেছি। সবই মূল বই থেকে নিয়ে খোদাইকরা, একটা লাইনও টাইটার নয়। সব আমি নোটবুকে লিখে রেখেছি।' নোটবুকটা রানাকে দেখাল ও, তারপর একপাশে সরিয়ে রাখল। দ্বিতীয় নোটবুকটা হাতে নিল। 'এটায় আছে ফলকের চতুর্থ পাশের

লিপির নকল। এগুলোর অর্থ আমি জানি না। শুধু সংখ্যার লম্বা তালিকা। সম্ভবত কোন ধরনের কোড বা সঙ্কেত। তবে এ-ব্যাপারে আমার একটা আইডিয়া আছে, সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'এবার এটা দেখুন,' বলে তৃতীয় একটা নোটবুক হাতে নিল নিমা। 'এখানে রয়েছে ফলকের তৃতীয় দিকটায় যে লিপি পাওয়া গেছে তার অনুবাদ। এগুলো উদ্ধৃতি হতে পারে না, কারণ প্রাচীন কোন ক্লাসিক্যাল বইতে এ-সব আমি পাইনি। এগুলোর বেশির-ভাগই, আমার ধারণা, টাইটার লেখা। সে যদি আরও কোন সূত্র রেখে গিয়ে থাকে, এই লিপির মধ্যেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

দুষ্ট ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'এটা সেই অংশ না, দেবীর লালচে আর ব্যক্তিগত পার্টসের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে?'

নোটবুক থেকে মুখ তুলতে পারল না নিমা। 'আপনি দেখছি ভোলার বান্দা নন।' সামান্য একটু লালচে হলো ওর চেহারা। 'ফলকের তৃতীয় দিকের মাথায় কি লেখা ছিল দেখুন। টাইটা এদিকটার নামকরণ করেছে, শরৎ। সবচেয়ে আগে এটাই আমার চোখে পড়েছিল।'

সামনের দিকে ঝুঁকে হায়ারোগ্লিফিক্স পড়ল রানা, 'পড়ছি— "ষাঁড় চতুষ্টয়ের প্রোটোকল মেনে নিয়ে মহান দেবতা অসিরিস প্রথম চাল দিলেন"। হ্যাঁ, এই অংশটুকু আগেও পড়েছি আমি। টাইটা বাও খেলার কথা বলছে এখানে, খেলাটা সে সাংঘাতিক ভালবাসত।'

'হ্যাঁ,' বলল নিমা। 'এবার বলুন, আমি যে স্বপ্নটার কথা বলেছিলাম, তা কি আপনার মনে আছে? যে স্বপ্নে হাসলান চাচাকে সমাধির একটা চেম্বারে দেখি আমি?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'মনে করিয়ে দিলে খুশি হই।'

'সেই স্বপ্নে চাচা আমাকে বলেন, "ষাঁড় চারটের আচরণ-বিধি মনে রাখবে—শুরু করবে প্রথম থেকে"।'

'খেলাটা সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?'

'খেলাটার নিয়ম বা কৌশল এত হাজার বছর পর হারিয়ে গেছে; তবে আপনি জানেন, এগারো আর সতেরোতম সাম্রাজ্যের সমাধির ভেতর পাওয়া জিনিস-পত্রের সঙ্গে বাও বোর্ডও ছিল, তা থেকে ধরে নেয়া চলে যে দাবা খেলারই অনুন্নত সংস্করণ ছিল সেটা।' নোটবুকের খালি একটা পৃষ্ঠায় স্কেচ আঁকল নিমা। 'কাঠের বোর্ড, খেলা হত দাবার বোর্ডের মত করে, ঘুঁটি হিসেবে থাকত আট সারি চওড়া কাপ, আট সারি গভীর কাপ। ওগুলো ছিল রঙিন পাথর, প্রত্যেকের আচরণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। বিশদ ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, তবে প্রথমেই চারটে ষাঁড়ের চাল দেয়া টাইটার মত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরই শোভা পায়। এই চালের অর্থ হলো, কিছু ঘুঁটি বিসর্জন দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির কাপগুলোকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে বোর্ডের মাঝখানটায় প্রভাব বিস্তার করা যায়।'

'বলে যান, শুনছি।'

'ছকের প্রথম সারির কাপ,' ইঙ্গিতে স্কেচটা দেখাল নিমা। 'চাচা বলেছেন,

প্রথম থেকে শুরু করবে। আর টাইটা বলেছে, মহান অসিরিস প্রথম চাল দিলেন।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আসুন আমার সঙ্গে,' বলে নোটবুক হাতে সাদা প্লাস্টার করা দরজার হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢুকল নিমা, দাঁড়াল অসিরিস-এর শ্রাইন-এর কাছে। 'প্রথম চাল। শুরু।' গ্যালারির দিকে মুখ করল ও। 'এটা প্রথম শ্রাইন। সব মিলিয়ে ক'টা শ্রাইন?'

'আটটা।'

'বাহ্, মাসুদ রানা দেখছি গুনতেও জানেন!'

'আটটা ওপর-নিচে, আটটা আড়াআড়ি...' থেমে গেল রানা, নিমার দিকে তাকিয়ে আছে। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন–'

জবাব না দিয়ে নোটবুকটা খুলল নিমা। 'এখানে যে সংখ্যা আর সঙ্কেত রয়েছে, অর্থবহ ভাষায় রূপান্তর করা সম্ভব নয়। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন রকম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। শুধু একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি, তালিকায় এমন কোন সংখ্যা নেই যেটা আট-এর চেয়ে বড়।'

'কি যেন বুঝেও বুঝতে পারছি না।'

'আজ থেকে চার হাজার বছর আগে কেউ যদি দাবার চাল ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করত, সে কি এভাবে সংখ্যা সাজিয়ে রাখত না?'

'নারী ছলনাময়ী! আপনি বলতে চাইছেন, টাইটা আমাদের সঙ্গে বাও খেলা খেলছে।'

'হ্যাঁ, আর প্রথম শ্রাইনটাই টাইটার প্রথম চাল।'

'কিন্তু খেলার নিয়ম যেখানে জানি না, টাইটার সঙ্গে এই খেলা আমরা খেলব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

হেস ডুগার্ড ডেকে পাঠিয়েছেন, গর্বিত ভঙ্গিতে কনফারেন্স রুমে ঢুকলেন কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা। পিছু নিয়ে ঢুকলেন কারিফ ফারুকীও, তিনিও নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে চেহারায় ভাবগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্যাস্তি ক্যাম্পবেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডুগার্ড, ওদেরকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন দ্রুত। ফারুকীকে যেন দেখতেই পাননি, কর্নেলকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল আমাকে রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল। খাদ থেকে আপনার ইনফরমার কোন মেসেজ পাঠায়নি?'

এক নিমেষে চুপসে গেলেন কর্নেল ঘুমা। জার্মান বিলিওনিয়ারকে খুব ভয় পান তিনি। 'দেরি হবার জন্যে দুঃখিত, হের ডুগার্ড। রানার ক্যাম্প থেকে মেয়েগুলো ফিরতে দেরি করে ফেলেছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু খবর পেতে দেরি হলে আমার তো চলবে না,' কর্কশ সুরে বললেন ডুগার্ড। 'রিপোর্ট দিন।'

'রানা বাঁধের কাজ শেষ করেছেন সাতদিন আগে। ভাটির দিকে সরে গেছেন তিনি, ঝুলন্ত মাচা বানিয়ে নালায় নেমেছেন। আমার ইনফরমার জানিয়েছে, খালি পুলের তলায় একটা ফাঁক পরিষ্কার করছে ওরা।'

'একটা ফাঁক? কি ধরনের ফাঁক?' অসুস্থ দেখাল হেস ডুগার্ডকে।

'গর্ত বা ফাটল হবে...'

'ব্যাখ্যা করুন, বর্ণনা দিন!' ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করছেন ডুগার্ড।

'যে মেয়ে মেসেজটা নিয়ে এসেছে তার মাথায় খুব একটা বুদ্ধি নেই, হের ডুগার্ড,' বললেন ঘুমা। 'পানি সরে যাবার পর পুলের তলায় নাকি একটা ফাঁক বা গর্ত দেখা গেছে। আবর্জনায় ভরা ছিল।'

'ওটা একটা টানেল!' হিসহিস করে উঠলেন ডুগার্ড। 'সমাধির ভেতর ঢোকার পথ পেয়ে গেছেন ওঁরা। আর কি দেখেছে সে?'

'মেয়েটা বলছে, ফাঁকটার ভেতর একটা গুহা আছে। পাথরের কুলুঙ্গি আর দেয়ালচিত্র আছে...'

'ওহ্, গড! দেয়ালচিত্র মানে কি? ক্রিশ্চান সেইন্টদের ছবি?'

ফারুকী বললেন, 'তা সম্ভব নয়, হের ডুগার্ড। আমি আপনাকে বলছি, মাসুদ রানা ফারাও মামোসের সমাধি আবিষ্কার করেছেন।'

'আপনি চুপ থাকুন!' হুঙ্কার ছাড়লেন ডুগার্ড। কর্নেলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মেয়েটা কি বলেছে সব আমাকে জানান।'

'দেয়ালচিত্র আর স্ট্যাচুর কথাই শুধু বলেছে, হের ডুগার্ড। দুঃখিত।'

'স্ট্যাচু? স্ট্যাচুও?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডুগার্ড। 'স্ট্যাচুগুলো কি সরিয়ে এনেছেন রানা?'

'বাক্সে ভরেছেন,' বললেন ঘুমা।

'রানা কি শ্রাইনে কোন মমি পাননি?'

'আমি জানি না, হের ডুগার্ড। মেয়েটা আর কিছু বলতে পারেনি।'

'কোথায় সে? আমার কাছে আনুন তাকে। আমি নিজে তাকে জেরা করতে চাই।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাম্য এক তরুণীকে কনফারেন্স রুমে নিয়ে আসা হলো। তার মুখে লাল আর কালো কালি দিয়ে ডোরা কাটা দাগ, পরনে ঢোলা আলখেল্লা, কাঁকালে দুধের বাচ্চা। আলখেল্লা সরিয়ে স্তনের বোঁটাটা বাচ্চার মুখে পুরে দিল সে। শিশু ও মা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডুগার্ডের দিকে।

'ওকে জিজ্ঞেস করুন কুলুঙ্গি বা শ্রাইনে কোন কফিন ছিল কিনা।'

এক মিনিট মেয়েটির সঙ্গে কথা বললেন কর্নেল। তারপর ডুগার্ডকে জানালেন, 'বোকা মেয়েলোক। বলছে, লাশ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে স্ট্যাচুগুলো বাক্সে ভরা হয়েছে। ওগুলো পাহারা দিচ্ছে একদল সৈনিক।'

'সৈনিক? সৈনিক মানে?'

'ও আসলে অ্যালান শাফির গেরিলাদের কথা বলতে চাইছে,' ব্যাখ্যা করলেন ঘুমা। 'কমান্ডার শাফি এখনও রানার সঙ্গে আছেন।'

'মোট ক'টা বাক্স? ক'টা স্ট্যাচু?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটিকে। তারপর ডুগার্ডকে বললেন, 'পাঁচটার কম নয়, দশটার বেশি নয়। ও ঠিক জানে না।'

'একেকটা কত বড়?'

কর্নেলের প্রশ্ন শুনে একটা হাত পুরোপুরি লম্বা করে দেখাল মেয়েটি।

ডুগার্ড বললেন, 'সংখ্যায় এত কম? আকারে এত ছোট?' জানালার সামনে এসে বাইরে তাকালেন তিনি। 'মেয়েটা যদি মিথ্যে কথা না বলে, রানা এখনও মামোসের ট্রেজার আবিষ্কার করতে পারেননি। আরও অনেক বেশি থাকার কথা।'

মেয়েটির সঙ্গে এখনও কথা বলছেন কর্নেল ঘুমা। ডুগার্ডের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ও বলছে, রুবি নামে একটা মেয়ে রানার ক্যাম্প থেকে ডেবরা মারিয়ামে গেছে, সঙ্গে আছে সন্ন্যাসীদের একটা দল। মেয়েটিকে আমি চিনি, হের ডুগার্ড। এক রাশিয়ান শিকারীকে বিয়ে করেছিল, এখন অবশ্য শাফির মনোরঞ্জন করছে।'

ছুটে মেয়েটির সামনে ফিরে এলেন ডুগার্ড। 'রুবি? ডেবরা মারিয়াম? কেন, ডেবরা মারিয়ামে কি করছে সে?'

প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়ল মেয়েটি। তারপর অ্যামহ্যারিক ভাষায় কিছু বলল। কর্নেল জানালেন, 'ও বলছে, কি করছে তা ও জানে না, তবে এখনও সে ডেবরা মারিয়ামে আছে।'

'মেঝেতে দুধ ফেলেছে! ভাগান ওকে, তাড়ান!' ঘৃণায় মুখ কোঁচকালেন ডুগার্ড। মেয়েটা চলে যেতে কর্নেলকে তিনি বললেন, 'এই রুবি সম্পর্কে আর কি জানেন বলুন আমাকে।'

'আদ্দিস আবাবার অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে,' বললেন ঘুমা। 'ওদের পরিবারের সঙ্গে সম্রাট হাইলে সেলাসির রক্তের সম্পর্ক আছে বলে শোনা যায়।'

'সে যদি গেরিলা কমান্ডার শাফির মেয়েমানুষ হয়, আর যদি রানার ক্যাম্প থেকে এসে থাকে, আমরা তার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি,' বললেন ডুগার্ড। 'কাজেই তাকে আমি চাই।'

'প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে, কিডন্যাপ করে আনলে সমস্যা হতে পারে,' চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে। 'তবে আমি তাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে গ্রেফতার করে আনতে পারি। আর সে যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে, তাকে আদ্দিস আবাবায় ফিরে যেতে দেয়া যাবে না। ওদের পরিবার আমাদের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'আপনার পরামর্শ কি?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

'জেরা করার পর ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'যা ভাল বোঝেন করবেন,' বললেন ডুগার্ড। 'তবে কোন কাজেই আমি খুঁত দেখতে চাই না।'

দুই

অসিরিস-এর শ্রাইন আরও একটা দিন পরীক্ষা করল ওরা। এখন এমনকি চোখ বুজেও শ্রাইনের ওপর দেয়ালচিত্রগুলো পরিষ্কার দেখতে পায় ওরা। এরপর

ট্যানাস-এর সমাধিতে পাওয়া ফলকের লিপিগুলো মুখস্থ করে ফেলল, নিমার নোটবুকে লেখা অনুবাদ পড়ে। একজন পড়ে, অপরজন দেয়ালচিত্রের দিকে তাকিয়ে মিল বা তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করে।

'আমার প্রেম উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফ্লাস্ক ভর্তি ঠাণ্ডা পানি। আমার প্রেম বাতাসে পতপত করা পতাকা। আমার প্রেম সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন।'

দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে হাসল নিমা। 'টাইটা মাঝে মধ্যে খুব রোমান্টিক হয়ে পড়ে।'

'কাজে মন লাগান। এখানে আমরা কাব্যচর্চা করতে আসিনি।'

'নীরস,' বিড়বিড় করল নিমা, তবে আবার চোখ তুলল দেয়ালে।

'আমি ভুগেছি আবার ভালবাসাও পেয়েছি। ঝড়-ঝাপটা আমাকে টলাতে পারেনি। তীর আমার মাংসভেদ করে গেছে, কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারেনি। সামনে পড়ে থাকা সরল অথচ ভুল পথ আমি এড়িয়ে গেছি। আমি গোপন সিঁড়ি ধরেছি, পৌঁছে গেছি দেবতাদের আসন পর্যন্ত।'

লম্বা গ্যালারি ধরে সামনে তাকাল নিমা। 'এই কথাগুলোর মধ্যে কিছু থাকতে পারে। "সামনে পড়ে থাকা সরল অথচ ভুল পথ...গোপন সিঁড়ি"?' কপাল থেকে চুল সরাল ও। 'নাহ্, রানা, আমার আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। কোত্থেকে শুরু করব তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য হারালে চলবে কেন,' বলল রানা, হাসল। 'আসুন, আপনার বন্ধুর মত প্রথম থেকে শুরু করি। পড়ছি আবার, কেমন? "প্রকাণ্ড ডানায় ভর দিয়ে শকুন আকাশে উড়ল সূর্যকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে"–'

রানার দিকে তাকিয়ে হাসতে যাবে নিমা, হঠাৎ সামনের দেয়ালে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল। 'শকুন!' বলে হাত তুলে রানার পিছনের দেয়ালটা দেখাল। ঘুরে সেদিকে তাকাল রানা।

ওদিকে একটা শকুন রয়েছে, ছবিটা এত সুন্দর যে কোন তুলনা হয় না। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঝরছে, হলুদ ঠোঁট বাঁকা ও ছুঁচাল। ডানাগুলো পুরোপুরি মেলা, প্রতিটি পালকের কিনারা বহুমূল্য পাথরের আকৃতিতে রঙ করা। প্রায় রানার মতই লম্বা পাখিটা, তবে মেলে দেয়া ডানা অর্ধেক দেয়াল দখল করে রেখেছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সরাসরি মাথার ওপর সিলিঙে তাকাল নিমা, তারপর রানার বাহু ছুঁয়ে ওকেও তাকাবার তাগিদ দিল।

'সূর্য,' ফিসফিস করল নিমা। রা-র সোনালি সূর্য-চাকতি আঁকা হয়েছে গম্বুজ আকৃতির ছাদের সবচেয়ে উঁচু অংশে। সূর্যের আভা যেন ছায়াগুলোকে আলোকিত করে রেখেছে। রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে সম্ভাব্য সবগুলো দিকে, তবে একটা রশ্মি দেয়ালের মোচড় খাওয়া অংশ অনুসরণ করে নেমে এসে আলোকিত করে রেখেছে শকুনটাকে। 'সূর্যকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আকাশে উড়ল শকুন,' আবার বলল নিমা। 'টাইটা কি আক্ষরিক অর্থেই বলেছে কথাটা?'

সামনে এগিয়ে এসে দেয়ালচিত্রটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করল রানা, হাত বুলাল ডানা, পেট আর বাঁকা ঠোঁটের ওপর। পেইন্টের নিচে প্লাস্টার করা দেয়াল মসৃণ। হাতে কিছুই ঠেকে না।

‘মাথাটা, রানা! মাথাটা দেখুন!’ লাফ দিয়ে শকুনের মাথা ছুঁতে চাইল নিমা, কিন্তু নাগাল পেল না। ‘আপনি চেষ্টা করুন।’

এবার রানাও শকুনের মাথার একপাশে সূক্ষ্ম একটা ছায়া দেখতে পেল, যেখানে ফ্লাডলাইটের আলো ক্ষীণ বাধা পেয়েছে। হাত তুলে স্পর্শ করার পর বুঝতে পারল দেয়ালের যে অংশে মাথাটা আঁকা হয়েছে সেটা দেয়ালের অন্যান্য অংশের চেয়ে চুল পরিমাণ ফুলে আছে। ‘ফোলা একটু ভাব থাকলেও, কোন জয়েন্ট আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,’ নিমাকে বলল ও। ‘একদম মসৃণ, একটা দেয়ালেরই অংশ মনে হচ্ছে।’

‘চাপ দিন! চাপ দিন! শকুনের মাথাটা সূর্যের দিকে ঠেলুন!’ তাগাদা দিল নিমা।

মাথায় তালু ঠেকিয়ে তাই করল রানা। ‘কই, কিছুই তো ঘটছে না!’

‘চার হাজার বছর ধরে এঁটে বসে আছে, জোর খাটান!’

জোর খাটাল রানা। হতাশ দেখাল ওকে। ‘এ নিরেট দেয়াল, নড়বে না!’

‘আমাকে তুলুন। আমাকে দেখতে দিন।’ নিমার কথামত ওর কোমরে দু’হাত রেখে ওপরে তুলল রানা। আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করছে নিমা। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ‘রানা! কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছেন আপনি! মাথার চারপাশের আউটলাইনের রঙে ফাটল ধরেছে। আঙুলে অনুভব করছি। আরও ওপরে তুলুন আমাকে।’

নিমাকে আরও একটু ওপরে তুলল রানা।

‘হ্যাঁ, কোনই সন্দেহ নেই!’ উল্লাসে কেঁপে গেল নিমার গলা। ‘কিছু একটা নড়ে গেছে। মাথার উপর দেয়ালে সরু চুলের মত খাড়া ফাটলও দেখতে পাচ্ছি। আপনি নিজেই দেখুন!’

খালি অ্যামুনিশনের একটা ক্রেট এনে শকুনটার নিচে রাখল রানা, সেটার ওপর উঠে দাঁড়াতে শকুন আর ওর চোখ একই লেভেল থাকল। চেহারা বদলে গেল ওর। পকেট নাইফ বের করে মাথাটার আউটলাইনের ফাটলে ফলাটা ঢোকাল। রঙ আর প্লাস্টার খসে পড়ছে গ্যালারির মেঝেতে। ‘মনে হচ্ছে মাথাটা আলাদা একটা অংশ,’ স্বীকার করতে হলো ওকে। ওটার ওপর খাড়া একটা চিড়ও এখন দেখতে পাচ্ছে রানা, তাতে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক চাপ দিতে তিন ফুট প্লাস্টার খসে পড়ল। টাইলের মেঝেতে পড়া মাত্র মিহি ধুলোয় পরিণত হলো সেটা। দেয়ালে একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। ‘একটা খাঁজ বলে মনে হচ্ছে। পুরোটা পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে আসলে কি।’

নিচে আরও প্লাস্টার খসে পড়ল। হাঁচি দিচ্ছে নিমা। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ছে না।

‘হ্যাঁ, খাড়া একটা খাঁজই বটে, ওপর দিকে উঠে গেছে,’ বলল রানা। এরপর শকুনের মাথার আউটলাইন থেকে প্লাস্টার খসাতে শুরু করল ও। ‘মাথাটা এখন মুক্ত,’ কাজটা শেষ করে বলল। ‘দেখে মনে হচ্ছে খাঁজ ধরে ওপর দিকে ওঠানো যাবে এটাকে। চাপ দিয়ে দেখব?’

‘একশো বার! হাজার বার!’ রুদ্ধশ্বাসে বলল নিমা।

শকুনের মাথার নিচে দুই হাতের তালু ঠেকিয়ে চাপ দিল রানা। চোখ-মুখ কুঁচকে উঠল ওর। সেই সঙ্গে নিমারও, যেন রানার সঙ্গে সে-ও চাপ দিচ্ছে।

নরম একটা ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো, মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে মাথাটা। খাঁজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওটা। লাফ দিয়ে বাক্স থেকে নেমে পড়ল রানা।

দু’জনেই ওরা বিচ্ছিন্ন মাথাটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পর ফিসফিস করল নিমা, ‘কই, কিছুই তো ঘটছে না!’

‘ফলকের বাকি লেখা কি বলে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তাই তো!’ দেয়ালের চারদিকে চোখ বুলাল নিমা, তারপর মুখস্থ বলে গেল, ‘আরও লেখা আছে–“শিয়াল ডেকে উঠে লেজের দিকে ঘুরে গেল”।’ খুদে আনুবিস-এর ছবির দিকে কাঁপা একটা হাত তুলল ও, কবরস্থানের দেবতা আনুবিস-এর মাথাটা শিয়ালের। শকুনের ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে তাঁর ছবিটা, অসিরিস-এর প্রকাণ্ড ছবির নিচে। সেদিকে ছুটল নিমা, শিয়ালের মাথায় তালু রেখে চাপ দিল। কিন্তু কোন লাভ হলো না।

‘সরুন, আমি দেখছি,’ বলে ছুরির ফলা দিয়ে শিয়ালের মাথার চারপাশ থেকে প্লাস্টার খসাল রানা। তারপর নতুন করে চাপ দিল। শুধু মাথা নয়, গোটা ছবিটা, ঘুরে যেতে শুরু করল, যতক্ষণ না কালো হলুদ টাইলসের দিকে ফিরল।

দু’জনেই পিছিয়ে এসে তাকিয়ে থাকল, প্রত্যাশায় চকচক করছে দু’জোড়া চোখ। কিন্তু এবারও কিছু ঘটল না।

‘ফলকে আরও একটা কথা লেখা আছে,’ বিড়বিড় করল নিমা। ‘মনে পড়ে? “নদী জমিনের দিকে গড়ায়। পবিত্র স্থানের অমর্যাদাকারীরা সাবধান, তোমাদের ওপর সমস্ত দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে”।’

‘নদী? আমি তো দেয়ালে কোন নদী দেখছি না!’

দেয়ালে তন্নতন্ন করে খুঁজছে নিমা। ‘পেয়েছি! হাপি!’ উত্তেজনায় সরু ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। ‘নীলনদের দেবতা! নদী!’

মহান দেবতা অসিরিস-এর মাথার সঙ্গে একই লেভেলে রয়েছেন নদীর দেবতা। হাপি উভলিঙ্গ, বুকে স্তন আছে, ফোলা পেটের নিচে পুরুষের জননেন্দ্রিয়। মাথাটা জলহস্তীর, হাঁ করা, চোয়ালের ভেতর বিশাল গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

কয়েকটা অ্যামুনিশন ক্রেটের ওপর দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করল রানা, ছুঁতে পারল হাপিকে। পরীক্ষা করার পর বলল, ‘এটাও আলাদা করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।’

‘নদী জমিনের দিকে গড়ায়, রানা। তারমানে নিচের দিকে নামবে ওটা। টানুন, রানা।’

‘আগে কিনারাগুলো পরিষ্কার করতে দিন।’ কাজটা শেষ করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। ছুরিটা পকেটে রেখে দিয়ে রানা বলল, ‘এবার কিছু একটা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। তৈরি থাকুন। আমার জন্যে একটু দোয়াও করতে পারেন।’

দেবতার ছবিতে দু’হাতের তালু রেখে নিচের দিকে চাপ দিল রানা, ধীরে

ধীরে শক্তি বাড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুই নড়ল না। 'কাজ হচ্ছে না।'

'দাঁড়ান, আমি আসছি!' বাক্সের ওপর উঠে রানার পিছনে দাঁড়াল নিমা, ওর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে সামান্য বাড়াল হাত দুটো, দেবতার ছবির ওপর তালু।

দু'জন মিলে চাপ দিচ্ছে। 'আরে, নড়ছে দেখছি!' হঠাৎ করে হাপির ছবি আলগা হয়ে গেল; ছুটে গেল ওদের হাত থেকে, তীক্ষ্ণ ঘষা খাওয়ার শব্দের সঙ্গে খাঁজ ধরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এল।

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় বাক্স সহ নিচে পড়ে গেল ওরা, রানার পিঠে বসে আছে নিমা। এক মুহূর্ত পর দু'জনেই লাফ দিয়ে সিধে হলো।

'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করল নিমা, তারপরই ঝট করে ছাদের দিকে তাকাল। ওপর থেকে গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। 'কি ঘটছে বলুন তো?' ওর গলায় আতঙ্ক। দু'জনেই মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ভুল, নাকি সত্যিসত্যি গোটা ছাদ নড়ছে?

'শব্দটা ভৌতিক লাগছে না?' ফিসফিস করল রানা। 'যেন ছাদের কোথাও বিশাল কোন প্রাণী নড়াচড়া করছে?'

আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে। মেঘ ডাকার মত গড়গড় করছে গোটা ছাদ। পাহাড় ধসের সঙ্গে অনেকটা মেলে। তারপর কামান দাগার মত বিকট শব্দ হতে লাগল।

উঁচু সিলিঙে একটা ফাটল ধরল, গ্যালারির পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে। আঁকাবাঁকা ফাটলটা থেকে ধুলোর মেঘ নেমে আসছে। তারপর, ধীরগতি দুঃস্বপ্নের মত, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি তার ওপরের ছাদটা ধসে পড়তে শুরু করল।

'টাইটার সতর্কবাণী!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'দেবতাদের অভিশাপ!' স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও, নড়ার শক্তি নেই।

খপ করে ওর একটা হাত ধরে টান দিল রানা। 'ছুটুন! বাঁচতে চাইলে ছুটুন!' নিমাকে নিয়ে খেঁচে দৌড় দিল ও।

গ্যালারি ধরে ছুটছে ওরা সীল করা প্রবেশপথের ফাঁকটার দিকে। পাথর আর প্লাস্টারের টুকরো বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে প্যাসেজে, ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। ওদের পিছনে অবিরত বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে, ধসে পড়ছে গোটা ছাদ। ওরা ছুটছে, ওদেরকে অনুসরণ করছে নিয়ন্ত্রণহীন পাথর ধস। পিছন দিকে তাকানোর সময় বা সাহস কোনটাই ওদের নেই, তবে পতনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে ফাঁকটা গলে বাইরে বেরুবার সময় ওরা পাবে না।

প্লাস্টারের একটা টুকরো নিমার কাঁধে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, রানা ধরে না ফেললে পড়ে যেত। না পড়লেও, আতঙ্কে হাঁটতে পারছে না। রানা ওকে টেনে নিয়ে আসছে। ধুলোয় সামনেটা দেখা যাচ্ছে না, প্রবেশপথের ফাঁকটা কত দূরে বোঝা যাচ্ছে না। 'প্রায় পৌঁছে গেছি,' মিথ্যে আশ্বাস দিল রানা। ওর কথা শেষ হবার আগেই প্লাস্টারের একটা টুকরো ফ্লাডলাইটে আঘাত করল। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল গ্যালারি।

রানা এখন পুরোপুরি অন্ধ, বাঁচার আকুতি প্রথমেই ওকে দিশা খুঁজে পাবার তাগাদা দিল। কিন্তু চারদিকেই ধসে পড়ছে ছাদ, প্রতি মুহূর্তে পতনের মাত্র

আরও বাড়ছে। বুঝতে পারল, যে-কোন মুহূর্তে গোটা ছাদ নেমে আসবে ওদের ওপর। কোথাও না থেমে ছুটছে ও, ভারী বোঝার মত টেনে আনছে নিমাকে। কিছুই না দেখে দেয়ালের শেষ মাথায় পৌঁছুল, ধাক্কা খেয়ে সব বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। ধুলোর মেঘের ভেতর প্লাস্টার করা দরজার গায়ে চৌকো ফাঁকটা অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ির মাথা থেকে আসা ল্যাম্পের আলোয় শুধু আভাসটুকু পাওয়া যায়। হ্যাঁচকা টানে নিমাকে বুকে তুলে নিল রানা, তারপর ফাঁকের ভেতর ছুঁড়ে দিল। ওপারে পড়ল নিমা, কাতর শব্দ ভেসে এল এপারে। আবর্জনার আরেকটা টুকরো লাগল রানার মাথার পিছনে, ব্যথায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে, দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পারছে না। শুনতে পেল নিমা ওর নাম ধরে চেঁচাচ্ছে।

ক্রল করে এগোল রানা। হাত তুলে ফাঁকটার নাগাল পেতে চাইছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা হাত ওর কব্জি চেপে ধরল। সিধে হলো রানা, ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল। আর ঠিক এক সেকেন্ড পরই গ্যালারির সম্পূর্ণ ছাদ ধসে পড়ল নিচে।

ল্যাম্পলাইটের আলোয় রানার হাত ধরে পথ দেখাল নিমা। 'কোথায় লেগেছে?' হাঁপাচ্ছে ও। কপালের ওপর চুলের ভেতর থেকে রক্তের একটা ধারা গালে নেমে আসছে, ধুলো মাখা মুখে লাল নদীর মত লাগছে দেখতে।

'তাড়াতাড়ি পা চালান,' বলল রানা। খকখক করে কাশছে ও। 'গোটা টানেল ধসে পড়তে পারে। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটল ওরা। তারপর ধুলোর ভেতর সামনে একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মারটিন।

'ওহ্ গড! আপনারা বেঁচে আছেন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'কি ঘটছে ওদিকে?'

রানা আর নিমা থামল না। 'পালিয়ে এসো!' কর্কশ সুরে বলল রানা।

ভাসমান সেতুর ওপর উঠে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল ওরা।

সন্ন্যাসীদের বাইরে রেখে পোস্ট অফিসে ঢুকল রুবি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আদ্দিস আবাবার লাইন পাওয়া গেল, ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে ভেসে এল ব্যারি গরডনের কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো?'

নিজের পরিচয় দিল রুবি।

'আমি আপনার কলের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' বলল গরডন। 'আপনারা সবাই কেমন আছেন, রুবি?'

রানার মেসেজটা মুখস্থ বলে গেল রুবি।

'আমার বন্ধুকে বলবেন ওর কথামত সব করা হবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল গরডন।

'এবার আমি,' পোস্ট মাস্টারকে বলল রুবি, 'আদ্দিস আবাবায় আরেকটা ফোন করতে চাই–মিশরীয় দূতাবাসে।'

দ্বিতীয় কলের লাইন পেতে একটু দেরি হলো। বিকেল পাঁচটার সময় মিশরীয় দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে আল মাসুদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো

রুবির। ভদ্রলোককে আগে থেকেই চেনে সে, কূটনীতিকদের কয়েকটা পার্টিতে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। ভদ্রলোক এক সময় রুবির প্রতি খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তবে রুবি তাঁকে ফোন করবে বলে আশা করেননি। তিনি জানতে চাইলেন, 'মীটিঙে যেতে হবে। বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

এই ভদ্রলোকের মাধ্যমে কায়রোর যাঁকে মেসেজটা দিতে হবে তাঁর নাম-ঠিকানা ও পদমর্যাদা একটা কাগজে লিখে দিয়েছে নিমা। নামটা শুনে কালচারাল অ্যাটাশে ভদ্রলোক রুবিকে খুশি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাম ও পদমর্যাদা ভুল শুনেছেন কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে দু'বার রিপিট করতে বললেন। সবশেষে লিখে নেয়া মেসেজটা পড়ে শোনালেন রুবিকে। 'ঠিক আছে তো?'

রাত হতে আর বেশি দেরি নেই, কাজেই আজ আর এসকার্পমেন্ট বেয়ে নিচে নামা সম্ভব নয়। কোথায় রাত কাটানো যায় ভাবছে রুবি, এই সময় গ্রামের সর্দার তার কিশোরী মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। রাতটা তাঁর বাড়িতে মেহমান হিসেবে কাটাবার অনুরোধ করেছেন তিনি। স্বস্তিবোধ করল রুবি, কিশোরীর সঙ্গে সর্দারের বাড়িতে চলে এল। অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে, তার সম্মানে রাতে বড়সড় একটা ভোজ দিলেন সর্দার। গ্রামে তাঁর বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা হলো বাড়ির উঠানে, তাঁবুর ভেতর। বাড়ির পিছনের একটা গেস্টরুম খুলে দেয়া হলো রুবিকে। ভোজন পর্ব শেষ হতে রাত গভীর হয়ে গেল। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল রুবি।

ওর ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। কিছুই সন্দেহ করেনি রুবি, গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করে দরজা খুলে দিল।

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা ইথিওপিয়ান সৈনিকরা, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বিছানায় পড়ল রুবি। তাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা, পিস্তল আর অটোমেটিক রাইফেল তাক করে আছে। এগিয়ে এসে রুবির চুলের গোছা ধরে টান দিল একজন, ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রুবি। লোকটা চড় মারতে যাবে, সৈনিকদের ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন একজন অফিসার। 'কি করছ! কাকে মারছ?' লোকটাকে চোখ রাঙালেন তিনি। 'ওঁনাকে তোমরা ক্রিমিন্যাল ভেবেছ নাকি? রাজধানীর অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের মেয়ে উনি।' রুবির দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট কমান্ডার কর্নেল জুলিয়াস ঘুমার নির্দেশে আপনাকে একবার আমাদের আর্মি হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে, মিস রুবি।'

'কেন, কি করেছি আমি?' ঢোক গিলে জানতে চাইল রুবি।

'গোজামে শুফতা, দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে কর্নেল আপনাকে প্রশ্ন করতে চান।'

তর্ক করে বা বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, অফিসারের সঙ্গে বেরিয়ে এসে একটা সামরিক ট্রাকে চড়ল রুবি। ট্রাকের সামনে অফিসারের সঙ্গে বসেছে ও, ড্রাইভার একজন সৈনিক। কিছুক্ষণ কোন কথা হলো না। তারপর অফিসার বললেন, 'ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে না। আপনাকে বলতে চাই, আপনার বাবাকে আমি চিনতাম। তাঁর প্রতি আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আজ রাতে যা ঘটছে তার জন্যে

সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা। ওপর থেকে নির্দেশ এলে আমাকে তা মেনে চলতে হয়।'

'আমি কোন অভিযোগ করছি না,' বলল রুবি।

'আমার নাম আহমেদ। যদি সম্ভব হয়, আপনাকে আমি সাহায্য করব,' কথা দিলেন লেফটেন্যান্ট আহমেদ।

'ধন্যবাদ, ভাই।'

ধুলো সরার জন্যে সময় দিতে হলো। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ গ্যালারি থেকে আলগা পাথর খসে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল ওদের কানে। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুর ওপর রয়েছে ওরা, ইতিমধ্যে নিমার মাথায় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে রানা। দু'জনের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর নয়।

দু'ঘণ্টা পর টানেলে ঢোকার জন্যে তৈরি হলো রানা। মারটিন আর নিমাকে সেতুর ওপর থাকতে বলল ও, রওনা হলো একাই, সঙ্গে নিয়েছে লম্বা একটা বাঁশ আর জেনারেটরের সঙ্গে সংযুক্ত হ্যান্ড ল্যাম্প।

খুব সাবধানে এগোচ্ছে রানা, এগোবার আগে বাঁশ দিয়ে টানেলের ছাদে খোঁচা মারছে। ল্যান্ডিঙে পৌঁছেই দেখতে পেল সমাধির প্রবেশপথটাকে সীল করে রেখেছিল যে প্লাস্টার করা দরজা, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো, আটটাই, ছিটকে পড়েছে এদিক সেদিক, কোন কোনটা আবর্জনায় ডুবে আছে। মূর্তিগুলোর কথা ভেবে মাথাটা ঘুরে উঠল রানার। একেকটা অক্ষত মূর্তির জন্যে বিলিওনিয়ার কালেক্টররা বস্তা বস্তা ডলার দিতেও দ্বিধা করবেন না, জানে ও। এত কষ্টকর আর ঝুঁকিবহুল অভিযান থেকে এই আটটা স্ট্যাচুই হয়তো সর্বমোট প্রাপ্তি ওদের, তা-ও যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, দুঃখের কোন সীমা থাকবে না।

আবর্জনা থেকে বাক্সগুলো উদ্ধার করল রানা। প্রত্যেকটা খুলে ভেতরে তাকাল, পরীক্ষা করল স্ট্যাচুগুলো। নেহাতই ওদের ভাগ্য বলতে হবে, সবগুলোই অক্ষত আছে। আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও, প্রতিবার একটা করে বয়ে নিয়ে এল সেতু পর্যন্ত।

সমাধির বাইরের ল্যান্ডিঙে ফিরে এসেছে রানা, ওর পিছনে এসে দাঁড়াল নিমা। কোন যুক্তিই মানল না, রানার সঙ্গে সে-ও টানেলে ঢুকল।

গ্যালারিতে ঢোকার মুখে স্থির হয়ে গেল নিমা। শোকে কাতর, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'এ আমি বিশ্বাস করি না!' ধরা গলায় বলল ও। 'টাইটা নিশ্চয়ই চায়নি এত সুন্দর শিল্পকর্ম এভাবে ধ্বংস হয়ে যাক।'

'মানে? কি বলতে চান?'

'পরে ব্যাখ্যা করব, কারণ নিজেই এখনও বুঝতে পারছি না,' বলল নিমা। 'শুধু জানি, টাইটাকে আমি যতটুকু চিনেছি, তার মধ্যে ধ্বংস করার প্রবণতা একেবারেই ছিল না। আপনি লোকজন ডেকে গ্যালারিটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুন।'

মারটিনকে ডেকে নিয়ে এল রানা। গ্যালারির অবস্থা দেখে হাঁ হয়ে গেল সে। কি করতে হবে শোনার পর বলল, 'সবচেয়ে বড় সমস্যা ধুলো। আবর্জনায় হাত দিলেই মেঘের মত উড়তে শুরু করবে।'

'কাজেই পানি দরকার,' বলল রানা। 'টানেল থেকে সিঙ্ক-হোল পর্যন্ত দুই লাইনে দাঁড় করিয়ে দাও লোকজনকে। একটা চেইন পানির বালতি আনবে, আরেকটা আবর্জনা সরাবে।'

'ঈশ্বরই জানে ক'দিন লাগবে!' হতাশ দেখাল মারটিনকে, তবে নাবুকে ডেকে এনে কাজটা বুঝিয়ে দিল সে।

সন্ন্যাসী বা গ্রামবাসী যুবকদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, কারণ এখনও তারা বিশ্বাস করে এটা একটা ধর্মীয় কাজ, অংশগ্রহণ করতে পারায় নরকের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। টোরা নাবুর নেতৃত্বে বাঘেরা কাজ শুরু করে দিল।

ভাঙা পাথর আর আবর্জনা বয়ে নিয়ে ফেলা হচ্ছে সিঙ্ক-হোলে। ওটা এত গভীর, পানির লেভেল উঁচু হলো না, সব গ্রাস করে নিচ্ছে। অল্প জায়গার ভেতর একশোর ওপর লোক কাজ করছে, পরিবেশটা গুমোট হয়ে উঠল। তাজা বাতাসের জন্যে টাইটার পুলে বেরিয়ে এল রানা। পুলটাকে ঘিরে থাকা পাঁচিলে এসে দাঁড়াতেই, দেখল ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে শাফি।

'রানা,' জিজ্ঞেস করল সে, 'ডেবরা মারিয়াম থেকে এখনও ফেরেনি রুবি? কালই না ওর ফিরে আসার কথা ছিল?'

'ওকে তো দেখিনি আমি। ভাবছিলাম ও বোধহয় তোমার সঙ্গে আছে।'

'ওর খোঁজে লোক পাঠাব, তাই ফিরেছে কিনা নিশ্চিত হতে এলাম,' বলল শাফি, চেহারায় শুধু উদ্বেগ নয়, অপরাধী অপরাধী ভাবও ফুটে আছে। ডেবরা মারিয়ামে রুবিকে পাঠানোর প্রস্তাবটা তারই ছিল।

রানারও খারাপ লাগছে। 'দুঃখিত, শাফি। ওকে এসকার্পমেন্টের ওপর পাঠানোটা বিপজ্জনক হতে পারে বলে আমিও ভাবিনি।'

'গোজামের সবাই ওকে চেনে,' বলল শাফি। 'বিপদ হবার তো কথা নয়। তবু, খোঁজ নিচ্ছি আমি।' চলে গেল সে।

পরবর্তী কয়েকটা দিন রুবিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হলো ওদেরকে। এদিকে গ্যালারি পরিষ্কার করার কাজও খুব ঢিমে তালে এগোচ্ছে। গ্যালারির মুখে রানার সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছে নিমা। দেয়ালচিত্রের প্রতিটি ভাঙা টুকরো দেখা মাত্র কান্না পাচ্ছে ওর, কাতর হয়ে পড়ছে শোকে। ছবির কোন অক্ষত অংশ দেখতে পেলেই নিজের দখলে রেখে দিচ্ছে। এক টুকরো প্লাস্টারে আইসিস-এর মাথাটা অক্ষত অবস্থায় পেল। আরেকটায় পেল থোত-এর পুরো ছবি।

লম্বা গ্যালারির ভেতর সময়ের কোন হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়, এখানে রাত ও দিন সমান। একেবারে ক্লান্ত ও বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত টানেল ছেড়ে বেরোয় না ওরা। তারপর যখন বেরোয়, টাইটার পুলের ওপর সরু আকাশে তারার মেলা দেখে সময় কাটায়, ক্লান্তি সত্ত্বেও চোখে ঘুম আসে না।

পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকছে দু'জন, কতভাবেই না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের আব্রু ঠিকই রক্ষা করে চলেছে নিমা। অজান্তে যা-ই ঘটে যাক,

সচেতনভাবে এমন কিছু করে না যাতে নিজে বা রানা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে মেয়েটার প্রকৃতি চিনে ফেলেছে রানা, নিমার সম্ভ্রম রক্ষার এই প্রবণতার প্রতি ওর শ্রদ্ধা জাগে, তবু রূপ-লাবণ্যে ভরপুর এই রমণীর ভালবাসা পাবার জন্যে মাঝে মধ্যেই অস্থির হয়ে ওঠে শরীর ও মন দুটোই। দু'তিন বার আকৃষ্ট করার চেষ্টাও করেছিল রানা, নরম সুরে সবিনয়ে এড়িয়ে গেছে নিমা, কখনও বুঝেও না বোঝার ভান করেছে।

পুলের পাশে ক্যাম্পে কয়েক ঘন্টা ঘুমাবার পর টানেলে ঢুকতে যাচ্ছে ওরা, আসমান সেতু পেরুচ্ছে, এই সময় গ্যালারির দিক থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। তারপর শোনা গেল বহু লোকের হৈ-চৈ। 'টোরা নাবু কিছু একটা পেয়েছে,' বলল নিমা। 'ধ্যেত, ওখানে আমাদের থাকা উচিত ছিল–' দৌড় দিল ও, পিছু নিয়ে রানাও।

গ্যালারির সামনে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা, দেখল অর্ধনগ্ন শ্রমিকরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, ইঙ্গিতে ও হাত নেড়ে পরস্পরকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল রানা ও নিমা, দেখতে পেল যেখানে অসিরিস-এর শ্রাইন ছিল সেই পর্যন্ত গ্যালারিটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। ওদের ওপর ছাদ ভাঙাচোরা আর এবড়োখেবড়ো, নিচে টাইলসের বিধ্বস্ত মেঝেতে পড়ে রয়েছে বিশাল আকারের একটা পাথুরে চাকা। এটা টাইটার মেকানিজম বা তার অবশিষ্ট, প্রাচীন ক্রীতদাস ছাদে ফিট করেছিল। ওরা, রানা ও নিমা, ডিভাইসটা অ্যাকটিভেট করায় ছাদটা ধসে পড়ে। বিশাল চাকাটাই মেকানিজমের মূল অংশ, দেখতে অনেকটা মিল হুইলের মত, ওজন হবে কয়েক টন। জিনিসটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

'রিভার গড পড়ার সময় নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করেছেন চাকার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল টাইটার,' নিমাকে বলল ও। 'রথের চাকা, পানি তোলার চাকা, আর এটা নিশ্চয়ই ব্যালেন্স হুইল–বুবি ট্র্যাপের জন্যে। আমরা লিভার নাড়তেই গোঁজ সরে যায়। ওই গোঁজই চাকাটাকে জায়গামত আটকে রেখেছিল। চাকা যে-ই ঘুরতে শুরু করল, গ্যালারির ওপর সিলিঙে সাজিয়ে রাখা প্রকাণ্ড পাথরগুলো খসে পড়ল ছাদে, ভেঙে পড়ল ছাদ।'

'এখন নয়, রানা!' ধৈর্য হারিয়ে বলল নিমা। 'পরে আপনার লেকচার শোনা যাবে। টাইটার ডেথ-ট্র্যাপ নাবুকে উত্তেজিত করেনি। সে অন্য কিছু আবিষ্কার করেছে। আসুন!'

ভিড় ঠেলে আরও সামনে এগোল ওরা, দাঁড়াল দীর্ঘদেহী নাবুর মুখোমুখি। 'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'কি পেয়েছ তুমি?'

পাল্টা চিৎকার করল নাবু, 'এদিকে, ম্যাডাম! জলদি আসুন!'

আরও কিছুটা এগিয়ে পাথর ধসে বন্ধ গ্যালারির সামনে থামল। 'ওই দেখুন!' হাত তুলল নাবু।

ভাঙা শ্রাইনের ভেতর একটা হাঁটু গাড়ল রানা। ফাটল ধরা পাথুরে দেয়ালে এখনও রঙ করা প্লাস্টারের টুকরো দেখা যাচ্ছে। ধসে পড়া দেয়ালের মুখ থেকে বড় একটা টুকরো সরাল নাবু, তারপর সদ্য তৈরি ফাঁকটার দিকে আঙুল তাক

করল। চোখের পলকে পালস রেট বেড়ে গেল রানার। গ্যালারির এক পাশে একটা পথ দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত আরেকটা টানেলের মুখ। মহান দেবতার প্লাস্টার মোড়া ছবির পিছনে লুকিয়ে ছিল। রানা তাকিয়ে আছে, বাহুতে নিমার স্পর্শ আর মুখের পাশে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল। 'এটাই, রানা! এই টানেলটাই! ফারাও মামোসের আসল সমাধিতে ঢোকার পথ। এই গ্যালারি, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা। আসল সমাধি আছে দ্বিতীয় টানেলের ভেতর।'

'নাবু!' আবেগে রুদ্ধ গলায় নির্দেশ দিল রানা, 'তোমার লোকদের বলো পথটা পরিষ্কার করুক।'

সঙ্গে সঙ্গে পাথর আর আবর্জনা সরাবার কাজ শুরু হয়ে গেল। ফাঁকটার ভেতর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা দরজা। এটাও চৌকো, তিন মিটার চওড়া, দুই মিটার লম্বা। লিনটেল আর চৌকাঠের বাজু নিখুঁতভাবে কাটা, পালিশ করা পাথর। দরজাটা ভেঙে পড়েছে, ভেতরে উঠে গেছে পাথুরে সিঁড়ির ধাপ।

তার টেনে নতুন দরজার মুখে আলোর ব্যবস্থা করা হলো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল রানা, দেখল ওর পাশে চলে এসেছে নিমা। 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব,' জেদের সুরে বলল ও।

'এখানে কোন ফাঁদ থাকতে পারে,' সাবধান করল রানা। 'হয়তো প্রথম বাঁকেই টাইটা আপনার জন্যে ওত পেতে আছে।'

'এ-সব বলে কোন কাজ হবে না, আমি যাবই।'

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা, প্রতি ধাপে থেমে দেয়াল আর সামনের দিকটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। বিশ ধাপ ওঠার পর আরেকটা ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা, দু'দিকে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। তবে সিঁড়িটা সোজা আরও ওপরে উঠে গেছে।

'কোনদিকে?' জানতে চাইল রানা।

'চলুন ওপরে উঠি,' বলল নিমা। 'সাইড প্যাসেজ দুটোয় পরে ঘুরে আসব।'

সাবধানে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। আরও বিশ ধাপ পেরুবার পর হুবহু একই রকম আরেকটা ল্যান্ডিং দেখা গেল, দু'দিকে দুটো দরজা। সিঁড়িটা এরপরও ওপরে উঠে গেছে।

রানাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নিমা বলল, 'ওপরেই উঠব।'

আরও বিশ ধাপের মাথায় আরেকটা ল্যান্ডিং, এটারও দু'দিকে একটা করে দরজা। সিঁড়িটাও উঠে গেছে নাক বরাবর। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না,' অভিযোগের সুরে বলল রানা।

কনুই দিয়ে ওর পিঠে খোঁচা মারল নিমা। 'কোন বাধা না পাওয়া পর্যন্ত ওঠা উচিত,' বলল ও। আবার উঠতে শুরু করে একই ধরনের আরও দুটো ল্যান্ডিং পেল ওরা।

'অবশেষে!' শেষ ল্যান্ডিঙে উঠে এসে বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। আশা করেছিল এটারও দু'দিকে দরজা দেখতে পাবে, পেলও দেখতে, কিন্তু সামনে আর কোন ধাপ নেই, তার বদলে নিরেট দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। 'এবার কি করবেন?'

'সব মিলিয়ে ক'টা ল্যান্ডিং?' জানতে চাইল নিমা।

'আটটা,' বলল রানা।

'আটটা,' পুনরাবৃত্তি করল নিমা। 'সংখ্যাটা খুব পরিচিত লাগছে না?'

ল্যাম্প লাইটের আলোয় নিমার মুখটা ভাল করে দেখল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন...'

'বলতে চাইছি গ্যালারিতে আটটা শ্রাইন রয়েছে বা ছিল, এখানে রয়েছে আটটা ল্যান্ডিং, বাও বোর্ডেও আটটা ঘুঁটি থাকে।'

টপ ল্যান্ডিঙে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'ঠিক আছে, এবার বলুন কোনদিকে যাবেন।'

'একটায় গেলেই হয়,' বলল নিমা। 'ডানদিকে চলুন।'

ডান দিকের দরজা দিয়ে একটা প্যাসেজে ঢুকল ওরা। খানিক দূর যাবার পর একটা টি-জাংশনে পৌঁছুল–সামনে নিরেট দেয়াল, দু'দিকে দুটো দরজা। 'আবার ডান দিকের প্যাসেজে ঢুকি আসুন,' বলল নিমা। তাই ঢুকল রানা। কিন্তু খানিক দূর যাবার পর আরেকটা টি-জাংশন পড়ল সামনে।

নিমার দিকে তাকাল রানা। 'কি ঘটছে বুঝতে পারছেন তো?' জিজ্ঞেস করল। 'টাইটার আরেকটা চালাকি। সে আমাদেরকে একটা গোলকধাঁধায় নিয়ে এসেছে। সঙ্গে লম্বা তার না থাকলে এতক্ষণে হারিয়ে যেতাম।'

ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল নিমা, তারপর দৃষ্টি ফেলল ডান ও বাম দিকের প্যাসেজে। শিউরে উঠে রানার বাহু খামচে ধরল ও। 'আমার ভয় করছে! চলুন ফিরে যাই। কেন যেন মনে হচ্ছে বিপদের মধ্যে আছি আমরা। এভাবে প্রস্তুতি না নিয়ে চলে আসা উচিত হয়নি।'

বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে প্যাসেজ ধরে ফেরার পথে ইলেকট্রিক তার গুটিয়ে নিচ্ছে রানা, ইচ্ছে হচ্ছে বিপদ এড়াবার জন্যে দৌড় দেয়। রানার গায়ে প্রায় সেঁটে আছে নিমা। দু'জনেরই মনে হচ্ছে অন্ধকার থেকে কে যেন লক্ষ রাখছে ওদের ওপর, পিছু নিয়েছে, অপেক্ষা করছে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে নয়, রুবিকে নিয়ে আসা হলো এসকার্পমেন্টের নিচে ফরেন প্রসপেক্টিং কোম্পানী প্রক্সির বেস ক্যাম্পে। রুবি অভিযোগ করায় লেফটেন্যান্ট আহমেদ কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না, বললেন, 'আমি শুধু কর্নেল ঘুমার নির্দেশ পালন করছি।'

বিশাল কনফারেন্স রুমে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল ঘুমা। ইউনিফর্ম পরে আছেন, চোখে মেটাল-ফ্রেমের চশমা, তবে মাথায় কিছু নেই। টেবিলের এক ধারে জ্যাক রাফেলও বসে আছে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। একটা চুরুট চিবাচ্ছে সে, আগুনটা নিভে গেছে।

'লেফটেন্যান্ট আহমেদ,' অ্যামহ্যারিক ভাষায় বললেন কর্নেল ঘুমা। 'আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে আপনাকে ডাকা হবে।'

লেফটেন্যান্ট চলে যাবার পর রুবি বলল, 'আমাকে অ্যারেস্ট করা হলো কেন, কর্নেল ঘুমা?'

দু'জনের কেউই জবাব দিল না, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রুবির দিকে।

'আমি কি এখন টয়লেটে যেতে পারি?' আবার জিজ্ঞেস করল রুবি।

এবার কথা বললেন কর্নেল, 'কুখ্যাত একদল টেরোরিস্টের সঙ্গে মেলামেশা করছেন আপনি। এর মানে হলো, ওদের মত আপনিও একজন গুণ্ডা।'

'এ আপনার মিথ্যে অভিযোগ।'

'অ্যাবে উপত্যকার একটা মিনারেল কনসেশনে অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনি,' বলল রাফেল। 'কুখ্যাত টেরোরিস্টদের নিয়ে এই কোম্পানীর নিজস্ব এলাকায় মাইনিং অপারেশন শুরু করেছেন।'

'কোথাও কোন মাইনিং অপারেশন শুরু হয়নি,' প্রতিবাদ করল রুবি।

'আমাদের কাছে আরও তথ্য আছে। আপনারা ডানডেরা নদীতে একটা বাঁধ দিয়েছেন।'

'তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে আপনি অস্বীকার করছেন না যে একটা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে?'

'বললামই তো, এ-সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' বলল রুবি। 'আমি কোন টেরোরিস্ট গ্রুপের মেম্বার নই। কোন মাইনিং অপারেশনেও অংশ নিইনি।'

নোটবুকে কি যেন লিখলেন কর্নেল। চেয়ার ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাফেল। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা দীর্ঘতর হচ্ছে। আবার চুপ মেরে গেছে ওরা।

রুবি বলল, 'ছয়-সাত ঘণ্টা একটানা ট্রাকে ছিলাম। আমি ক্লান্ত। আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।'

'টয়লেটের কাজ আপনি এখানেই সারতে পারেন। আমি বা মি. রাফেল খারাপ বোধ করব না।' হাসলেন কর্নেল, তবে নোটবুক থেকে চোখ তুললেন না।

ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল রুবি। জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রাফেল। রুবি ভাবল, এদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না যে সে ভয় পেয়েছে। খুবই ক্লান্ত সে, তলপেট ব্যথা করছে, তবু চেহারায় মর্যাদার ভাব ফুটিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

মুখ তুলে ভুরু কোঁচকালেন কর্নেল। রুবির কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ তিনি আশা করেননি। 'গুণ্ডা ডাকাত অ্যালান শাফির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না!' হঠাৎ অভিযোগ করলেন তিনি।

'অ্যালান শাফি ডাকাত নন,' বলল রুবি। 'তিনি সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী একজন শ্রদ্ধেয় নেতা।'

'আপনি তার উপপত্নী। বেশ্যাও বলা চলে।'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল রুবি।

হঠাৎ গর্জে উঠলেন কর্নেল ঘুমা, 'অ্যালান শাফি কোথায়? তার সঙ্গে ডাকাতরা মোট ক'জন?' রুবির দৃঢ় মনোভাব অস্থির করে তুলেছে তাঁকে।

রুবি জবাব দিল না।

'কথা বলুন! মুখ খুলুন!' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'তা না হলে আপনাকে টরচার করা হবে।'

মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল রুবি।

দ্রুত পায়ে হেঁটে কর্নেলের পিছনে চলে এল রাফেল, পিছনের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কনফারেন্স রুম থেকে। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। খানিক পর আবার ফিরে এল, কর্নেলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল ঘুমা। তারপর দু'জনই রুবির সামনে চলে এল।

'ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল,' বলল রাফেল। 'আমাকেও ব্রেকফাস্টে বসতে হবে, আপনাকেও টয়লেটে যেতে হবে। কর্নেল সরকারী কর্মচারী, তাঁকে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। আমার ও-সব বালাই নেই। উনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন, আমিও সেগুলো করব। তবে এবার আপনাকে উত্তর দিতে হবে।' কথা শেষ করে চুরুটে আগুন ধরাল সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অ্যালান শাফি কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রুবি, ঘাড় ফিরিয়ে আবার জানালার বাইরে তাকাল।

আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দুম করে রুবির মুখে ঘুসি মারল রাফেল। একটা মেয়েকে এভাবে কেউ ঘুসি মারতে পারে, ভাবা যায় না। ছিটকে চেয়ার সহ মেঝেতে পড়ে গেল রুবি। এগিয়ে এসে তার পেটে সবুট লাথি মারল রাফেল। 'বেশ্যা মাগী, কথা বলিস না কেন?'

এরপর এগিয়ে এলেন কর্নেল ঘুমা। রুবির বুকের মাঝখানে একটা পা রাখলেন তিনি, তারপর ঝুঁকে চুলের গোছা ধরে টান দিলেন। 'নতুন করে শুরু করা যাক। অ্যালান শাফি এখন কোথায়?'

ঘুসি আর লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হয়েছে রুবির। এবার তার ওপর ঝুঁকল রাফেল, ট্রাউজারের বেল্টটা খুলে নিল। 'এখনও সময় আছে, কথা না বললে ন্যাংটো করে চুরুটের ছ্যাঁকা দেয়া হবে গায়ে। কোথায় সে? কি করছে অ্যালান শাফি? তোর সঙ্গী-সাথীরা ডানডেরা নদীতে বাঁধ দিয়েছে কেন?'

মুখের ভেতর থুথু জমিয়ে রাফেলের চোখে ছুঁড়ে দিল রুবি। ছিটকে দূরে সরে গেল রাফেল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

'ধরে রাখুন শালীকে!' কর্নেলকে বলল সে। রুবির বুক থেকে পা নামিয়ে বসে পড়লেন কর্নেল, তারপর শক্ত করে হাত দুটো ধরলেন।

পা ছুঁড়ছে রুবি, কিন্তু দু'জন শক্তসমর্থ পুরুষের সঙ্গে সে পারবে কেন। তার ট্রাউজার খুলে ফেলল রাফেল। তারপর শার্টটাও ছিঁড়ে ফেলল। 'কোথায় সে? কি করছে অ্যালান শাফি?' জিজ্ঞেস করল রাফেল, রুবির স্তনের বোঁটার কাছে জ্বলন্ত চুরুট সরিয়ে আনল।

মরিয়া হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল রুবি, কিন্তু কর্নেল তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রেখেছেন। আর্তনাদ করে উঠল রুবি, চুরুটের লালচে ডগা তার স্তনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

তিন

'শীতকাল,' বলল নিমা, টানুসের সমাধিতে পাওয়া ফলকের চতুর্থ দিকটার এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ ফ্লাডলাইটের আলোয় মেলে ধরল। 'এদিকটাতেই টাইটার নোটেশন রয়েছে, যেটাকে আমি বাও বোর্ড বলে মেনে নিয়েছি। সংখ্যা ও সঙ্কেত সবগুলো আমি বুঝি না, তবে বাদ দেয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে প্রথম সঙ্কেতটা চারটে দিকের একটাকে চিহ্নিত করে। এই চারটে দিককে বোর্ডের একেকটা দুর্গ হিসেবে বর্ণনা করেছে সে।' নোটবুকের পাতাগুলো দেখাল রানাকে, ওগুলোয় হিসাব করেছে ও।

'এদিকে দেখুন, উত্তর দুর্গে বসে আছে বেবুন, দক্ষিণ দুর্গে মৌমাছি, পশ্চিমে পাখি আর পুবে কাঁকড়া বিছে। ফলকের ফটোগ্রাফেও চিহ্নগুলো রয়েছে,' আঙুল দিয়ে দেখাল রানাকে। 'তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফিগার, এগুলো সংখ্যা–আমার ধারণা, এগুলো ফাইল আর কাপ-এর প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলোর সাহায্যে আমরা তার কাল্পনিক লাল পাথরের চাল অনুসরণ করতে পারব। লাল হলো বোর্ডের হাইয়েস্ট-র‍্যাংকিং কালার।'

'প্রতি সেট নোটেশনের মাঝখানে স্তবকগুলো কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যেমন এখানে লেখা রয়েছে উত্তুরে বাতাস আর ঝড় সম্পর্কে।'

'আমি জানি না, স্মোকস্ক্রীন হতে পারে। কোন কাজই সে আমাদের জন্যে সহজ করে রাখেনি। ওগুলোর কোন তাৎপর্য থাকতেও পারে, তবে সেটা ধরা পড়বে আমরা যখন আমাদের পাথর দিয়ে চাল দিতে দিতে খেলাটায় অনেক দূর এগিয়ে যাব।' নিমা এবার মুখ তুলে পাথুরে সিঁড়ির দিকে তাকাল, যে সিঁড়ি টাইটার গোলকধাঁধার দিকে উঠে গেছে। 'এবার দেখতে হবে আমার থিওরির সঙ্গে টাইটার আর্কিটেকচারের কঠিন পাথর আর দেয়াল মেলে কিনা। প্রশ্ন হলো, আমরা শুরু করব কোত্থেকে?'

'প্রথম থেকে,' বলল রানা। 'দেবতা প্রথম চাল দিলেন। টাইটা তো তাই জানিয়েছে। আমরা যদি অসিরিস-এর শ্রাইন থেকে শুরু করি, সিঁড়ির গোড়া থেকে, তাহলে আমরা হয়তো তার কাল্পনিক বাও বোর্ডের অ্যালাইনমেন্ট পেয়ে যাব।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল নিমা। 'আসুন ধরে নিই এটা টাইটার বোর্ডের উত্তর দুর্গ। এখান থেকে আমরা ষাঁড় চতুষ্টয়ের প্রটোকল আবিষ্কার করব।'

কঠিন ও একঘেয়ে কাজ, এগোল শম্বুকগতিতে। প্যাসেজ আর টানেলের ভেতর বারবার ঢুকে প্রাচীন লেখকের মন ও মস্তিষ্কের ভাব আর চিন্তাধারা চার হাজার বছর পর আঁচ করতে চাওয়া। গোলকধাঁধায় এখন ওরা ঢুকেছে চক নিয়ে, প্রতিটি টানেলের শাখা ও মোড়ের দেয়াল চিহ্নিত করছে রানা, লিখে রাখছে

শীতকাল শিরোনামে ফলকের দিকটায় পাওয়া নোটেশন।

ওরা বুঝতে পারল ওদের প্রথম ধারণাটা সঠিক হয়েছে, অসিরিস-এর শ্রাইন হলো বোর্ডের উত্তর দুর্গ। কাজেই খুশি হয়ে উঠল মন, জানে এটাকে সূত্র ধরে খেলার চাল আবিষ্কার করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু আবার হতাশ হতে হলো যখন বুঝল প্রচলিত বোর্ডের সহজ দুই ডাইমেনশন-এর কথা ভাবেনি টাইটা। সমীকরণে তৃতীয় একটা ডাইমেনশন যোগ করেছে সে।

অসিরিস-এর শ্রাইন থেকে উঠে যাওয়া সিঁড়িটাই আটটা ল্যান্ডিঙের মাঝখানে একমাত্র লিঙ্ক নয়। সিঁড়ি থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি প্যাসেজ অতি সূক্ষ্মভাবে হয় ওপরে উঠে গেছে, নয়তো নিচে নেমেছে। এ-ধরনের একটা টানেল অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক মোচড় আর বাঁক ঘুরতে হলো ওদেরকে, অথচ টেরই পেল না যে ওদের লেভেল বদলে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ ওরা সেন্ট্রাল ল্যান্ডিঙে বেরিয়ে এল, তবে যেটা ধরে ঢুকেছিল তারচেয়ে এক ল্যান্ডিং ওপরে।

ওখানে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমা। 'একবারও মনে হয়নি যে ওপরে উঠছি। আমাদের ধারণার চেয়ে গোটা ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি জটিল, রানা।'

'ভীতিকর,' মন্তব্য করল রানা।

'তবে কিছু প্রতীকের অর্থ এখন আমার কাছে পরিষ্কার,' বলল নিমা। 'ওগুলো লেভেল-এর প্রতিনিধিত্ব করে। গোটা ছকটা আবার নতুন করে সাজাতে হবে।'

'থ্রী-ডাইমেনশনাল বাও, ধাঁধা মেলানোর নিয়মে খেলতে হবে,' বলল রানা। 'আমাদের আসলে একটা কমপিউটর দরকার। বুড়ো ক্রীতদাস সত্যিই জিনিয়াস ছিল। জানা সত্ত্বেও বোঝার উপায় নেই যে টানেলের মেঝে ওপরে উঠেছে নাকি নিচে নেমেছে, অথচ তার কাছে একটা পাইড রুল পর্যন্ত ছিল না। এই গোলকধাঁধা আশ্চর্য এক এঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়।'

'তার প্রশংসা পরে করলেও চলবে,' বলল নিমা। 'এখন আসুন সংখ্যাগুলো নতুন করে সাজাই।'

'তার আগে এই সেন্ট্রাল ল্যান্ডিঙে আলো আর ডেস্ক নিয়ে আসি,' বলল রানা। 'বোর্ডের মাঝখান থেকে কাজ শুরু করা উচিত বলে মনে করি। চাক্ষুষ বা আন্দাজ করা সহজ হতে পারে।'

কামরার ভেতর শুধু নরম একটা গোঙানির শব্দ হচ্ছে। নিজের রক্ত আর প্রস্রাবের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। কর্নেল ঘুমা কনফারেন্স টেবিলে বসে একটা চুরুট ধরালেন। হাত সামান্য একটু কাঁপল, দেখে মনে হলো অসুস্থ। তিনি একজন সৈনিক, মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে অভ্যস্ত, তিনি নিজেও একজন নিষ্ঠুর মানুষ। কিন্তু আজ যা চাক্ষুষ করলেন, তাঁর বুকটা রীতিমত কেঁপে গেছে। এখন তিনি জানেন হেস ডুগার্ড কেন এত ভরসা করেন রাফেলের ওপর। লোকটা আসলে মানুষ নয়, জানোয়ার।

কামরার আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছোট একটা বেসিনে হাত ধুচ্ছে রাফেল। সময় নিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো মুছল সে, কাপড়ে লাগা রক্তের দাগও মুছল,

তারপর হেঁটে এসে দাঁড়াল রুবির সামনে। 'আর বোধহয় কিছু বলার নেই ওর,' শান্ত সুরে বলল সে। 'কিছু গোপন করেছে বলে মনে হয় না।'

রুবির দিকে তাকালেন কর্নেল। গোটা বুক আর মুখ জুড়ে পোড়া দাগগুলো দগদগে ঘায়ের মত লাগছে। উপুড় করলে নিতম্বেও এই দাগ দেখা যাবে। চোখ বুজে পড়ে রয়েছে রুবি, চোখের পাপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখ খোলেনি মেয়েটা। শুধু রাফেল যখন তার চোখের পাতায় জ্বলন্ত চুরুট ছোঁয়াল, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি, গড়গড় করে সব বলে ফেলেছে।

খানিকটা স্বস্তিবোধ করছেন কর্নেল ঘুমা। রাফেল তাঁকে রুবির চোখের পাতা খুলে রাখতে বলেছিল। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি।

'ওর ওপর নজর রাখুন,' নির্দেশের সুরে বলল রাফেল, শার্টের গুটানো আস্তিন কব্জিতে নামাল। কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা খোলা রেখে গেল, ফলে জার্মান ভাষার দু'একটা শব্দ শুনতে পেলেন কর্নেল। এখন তিনি জানেন পাশের ঘরেই রয়েছেন হেস ভুগার্ড। রাফেলের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন ভদ্রলোক, সেজন্যেই কনফারেন্স রুমে ঢোকেননি।

ফিরে এসে কর্নেলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রাফেল। 'ওকে আর দরকার নেই আমাদের। কি করতে হবে আপনি জানেন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়লেন কর্নেল, হোলস্টারে হাত রাখলেন। 'এখানে? এখুনি?'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' ধমক দিল রাফেল। 'অন্য কোথাও পাঠান। দূরে কোথাও। তারপর কাউকে ডেকে জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলুন।' আবার পাশের ঘরে চলে গেল সে।

দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করলেন কর্নেল, 'লেফটেন্যান্ট আহমেদ!'

দু'জন মিলে রুবিকে কাপড় পরাল ওরা। তার ট্রাউজার আর শার্টও অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে। কাপড় পরাবার সময় আহমেদ রুবির দিকে না তাকাবার চেষ্টা করলেন। 'ট্রাকে একটা চাদর আছে, নিয়ে আসি,' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন একটু পরই। রুবির ট্রাউজার আর শার্টের ওপর চাদরটা জড়িয়ে দেয়া হলো, তারপর দু'জন মিলে দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। কর্নেল কনফারেন্স রুম থেকে বেরুলেন না, আহমেদ একাই রুবিকে নিয়ে ট্রাকের দিকে এগোলেন। প্যাসেঞ্জার সীটে বসানো হলো রুবিকে। দু'হাতে পোড়া মুখটা ঢেকে রেখেছে সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আহমেদকে আবার ডাকলেন কর্নেল। শান্ত সুরে নির্দেশ দিলেন তিনি। নির্দেশ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন আহমেদ। এক পর্যায়ে প্রতিবাদ করতে গেলেন তিনি, খেঁকিয়ে উঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। তারপর বললেন, 'মনে রাখবেন, জায়গাটা কোন গ্রামের কাছাকাছি হওয়া চলবে না। নিশ্চিত হয়ে নেবেন, কোন সাক্ষী যেন না থাকে। কাজ শেষ করেই রিপোর্ট করবেন আমাকে।'

স্যালুট করে ট্রাকে ফিরে এলেন লেফটেন্যান্ট, ক্যাবে রুবির পাশে উঠে বসলেন। নির্দেশ পেয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

ব্যথায় দিশেহারা বোধ করছে রুবি, সময় সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। উঁচু পথ ধরে ছুটছে ট্রাক, প্রায় অচেতন রুবির মাথা ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে। মুখটা এত ফুলে আছে, চোখ খুলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। খোলার পর মনে হলো অন্ধ হয়ে গেছে সে। তারপর বুঝতে পারল—না, সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। তারমানে রাফেল তাকে প্রায় সারাটা দিন কনফারেন্স রুমে আটকে রেখেছিল।

চোখ খুলে উইন্ডস্ক্রীনে তাকিয়ে আছে রুবি, হেডলাইটের আলোয় সামনের পথটা চিনতে পারল না। 'আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' বিড়বিড় করল সে। 'এটা তো গ্রামে ফেরার পথ নয়।'

নিজের সীটে লেফটেন্যান্ট আহমেদ যেন আরও কুঁজো হয়ে গেলেন, কোন কথা বললেন না। ব্যথায় আর ক্লান্তিতে রুবিও আর কোন প্রশ্ন করল না। চোখ বুজে সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক, ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভাঙল রুবির। কর্কশ কয়েক জোড়া হাত ক্যাব থেকে নামিয়ে হেডলাইটের আলোয় দাঁড় করাল তাকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত দুটো পিছনে আনা হলো, বাঁধা হলো চামড়ার বেল্ট দিয়ে। 'আপনারা আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন,' ফুঁপিয়ে উঠল বেচারি।

বাঁধা কব্জি ধরে টান দিল একজন সৈনিক, রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এল রুবিকে। আরও দু'জন সৈনিক পিছু নিল ওদের, হাতে কোদাল। রাস্তা থেকে একশো মিটার দূরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর থামল ওরা। একটা গাছের গোড়ায় বসানো হলো তাকে, পাতার ফাঁক দিয়ে গায়ে চাঁদের আলো পড়ছে। ওই আলোতেই রুবি দেখতে পেল তার জন্যে কবর খোঁড়া হচ্ছে। কবর খুঁড়ছে দু'জন লোক, অপর লোকটা তার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে নাগালের ঠিক বাইরে।

'প্লীজ,' ফিসফিস করল রুবি। 'আমাকে মারবেন না!'

কথার জবাব না দিয়ে সৈনিক এক পা এগোল, সবুট লাথি মারল রুবির পাঁজরে। 'একদম চুপ!'

ব্যথার চেয়ে মৃত্যু ভয় বেশি কাহিল করে ফেলল রুবিকে।

কবর খোঁড়া হয়ে গেল। গর্ত থেকে উঠে এল সৈনিক দু'জন। ট্রাক থেকে নেমে এলেন লেফটেন্যান্ট আহমেদ, হাতে একটা টর্চ। টর্চের আলোয় কবরের গভীরতা দেখলেন তিনি। 'গুড। যথেষ্ট গভীর হয়েছে।' টর্চটা নিভিয়ে দিলেন। 'তোমরা সবাই ট্রাকের কাছে চলে যাও। কর্নেল বলে দিয়েছেন, কোন সাক্ষী থাকা চলবে না। গুলির আওয়াজ হলে ফিরে আসবে, কবরে মাটি ফেলতে সাহায্য করবে আমাকে।'

সৈনিকরা ফিরে গেল।

এগিয়ে এসে রুবিকে ধরে দাঁড় করালেন আহমেদ, টেনে আনলেন কবরের কাছে। 'আপনার চাদরটা দিন আমাকে,' বলে নিজেই রুবির গা থেকে খুলে নিলেন সেটা। তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন কবরের ভেতর। রুবি শুনতে পেল হাত দিয়ে কবরের তলার মাটি নাড়াচাড়া করছেন লেফটেন্যান্ট। তারপর

তার নিচু গলা শুনতে পেল, 'কবরের ভেতর কিছু একটা দেখাতে হবে ওদেরকে। দেখে যাতে মনে হয় লাশ...'

গর্ত থেকে উঠে এসে রুবির পিছনে দাঁড়ালেন আহমেদ। চামড়ার বেল্টটা কব্জি থেকে খুলে ফেলে দিলেন কবরের ভেতর। দিশেহারা রুবি ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি করছেন আপনি?' কবরের ভেতর তাকিয়ে দেখল চাদরের ওপর এমন ভাবে মাটি ফেলা হয়েছে, দেখে মনে হবে ভেতরে একটা লাশ আছে।

'প্লীজ, কথা বলবেন না!' চাপা গলায় সতর্ক করে দিলেন আহমেদ। রুবিকে নিয়ে চলে এলেন ঘন একটা ঝোপের ভেতর, বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে শুয়ে পড়ুন। পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়বেন না বা কথা বলবেন না।'

কবরের কাছে ফিরে এসে পিস্তলের ফাঁকা দুটো আওয়াজ করলেন আহমেদ। তারপর তাঁর চিৎকার শুনতে পেল রুবি, 'চলে এসো তোমরা, কাজটা শেষ করি।'

সৈনিকরা কবরের কাছে ফিরে এল। ঝোপের ভেতর থেকে মাটিতে কোদালের কোপ মারার আওয়াজ পেল রুবি, গর্তটা ভরা হচ্ছে। একজন সৈনিক বলল, 'লেফটেন্যান্ট, আপনার টর্চটা জ্বালছেন না কেন? কবরের ভেতরটা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'মাটি ভরার জন্যে আলো লাগবে কেন?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন আহমেদ। 'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো। আলগা মাটি সমান করে দেবে, আমি চাই না এখানে এসে কেউ হোঁচট খাক।'

কিছুক্ষণ পর মাটি ভরার কাজ শেষ হলো, ট্রাক নিয়ে ফিরে গেল সৈনিকরা। স্বস্তি, ব্যথা ও ক্লান্তিতে ঝোপের ভেতর শুয়ে কাঁদছে রুবি। আরও কিছুক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে, একটা গাছ ধরে দাঁড়াল, টলছে।

এতক্ষণে অপরাধবোধটা গ্রাস করল তাকে। ভাবল, শাফির সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, শত্রুপক্ষকে বলে দিয়েছি সব কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে তাকে আমার সাবধান করা উচিত।

টলতে টলতে রাস্তার দিকে এগোল রুবি।

টাইটার কোড ভাঙা গেছে কিনা বোঝার একমাত্র উপায় হলো তার তৈরি তালিকায় পাওয়া চাল অনুসারে খেলাটা চালিয়ে যাওয়া। কুটিল ছকে তৈরি টানেলের শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল ওরা, টাইটার চাল ধরে এগোচ্ছে, সেগুলো সাদা চক দিয়ে এঁকে রাখছে দেয়ালের গায়ে।

ফলকের শীতকাল শিরোনামে আঠারোটা চাল রয়েছে। নিমা যেটাকে প্রথম চাল ধরে নিয়েছে সেখান থেকে বারোটা চাল পর্যন্ত এগোনো সম্ভব হলো। কিন্তু তারপর সামনে পড়ল নিরেট দেয়াল, পরবর্তী চালে পা ফেলার কোন সুযোগ নেই।

'ধ্যেত, এত পরিশ্রম সব বৃথা গেল,' দেয়ালটায় লাথি মেরে বলল রানা।

'দুঃখিত,' চোখ থেকে চুল সরাল নিমা। 'আমারই কোথাও ভুল হয়েছে। দ্বিতীয় কলামের ফিগার উল্টো করে ধরে এগোতে হবে।'

'তারমানে নতুন করে শুরু করো আবার!'

'হ্যাঁ, প্রথম থেকে।'

'খেলাটা যদি ঠিকমত খেলতেও পারি, জানব কিভাবে খেলতে পেরেছি?' জানতে চাইল রানা।

'সূত্র অনুসরণ করে আমরা যদি একটা উইনিং কম্বিনেশনে পৌঁছুতে পারি, সেটা হবে চালমাত, ঠিক আঠারো চালের মাথায়। এরপর আর যুক্তিসঙ্গত কোন চাল থাকবে না, তখন ধরে নিতে হবে খেলাটা আমরা শেষ করতে পেরেছি।'

'ওই পজিশনে পৌঁছে কি পাব আমরা?'

'ওখানে পৌঁছুনোর পর বলতে পারব।' মিষ্টি করে হাসল নিমা। 'হাসিখুশি থাকুন, রানা। কষ্টের মাত্র শুরু হয়েছে।'

টাইটার নোটেশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির সংখ্যাগুলোর মূল্যমান নতুন করে নির্ধারণ করল নিমা, প্রথমগুলোকে ধরল কাপ মূল্যমানে, দ্বিতীয়গুলোকে ফাইল মূল্যমানে। কিন্তু এভাবে মাত্র পাঁচটা চাল এগোনো গেল, তারপর আর সামনে বাড়ার পথ নেই।

'তৃতীয় সারির প্রতীকগুলোকে আমরা লেভেল পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে ধরেছি, হয়তো এখানে ভুল হচ্ছে,' বলল রানা। 'আসুন আবার শুরু করি, এবার ওগুলোকে দ্বিতীয় মূল্যমান দিই।'

'তাতে প্রচুর সময় লাগবে,' প্রতিবাদ করল নিমা। 'তারচেয়ে আসুন, নোটেশনের মাঝখানে টাইটা যে-সব উক্তি করেছে সেগুলো আরেকবার পড়ি। দেখা যাক কোন সূত্র বেরোয় কিনা।'

'বেশ।'

'প্রথম কোটেশন,' হায়ারোগ্লিফিক্সে আঙুল রাখল নিমা। পড়ছি–''নাম থাকলে জিনিসটাকে চেনা যায়। নামবিহীন জিনিস শুধু অনুভব করা যায়। পিছনে জোয়ার আর মুখে বাতাস নিয়ে জলপথে ভ্রমণ করেছি আমি। হে, ভালবাসা আমার, তোমার স্বাদ আমার ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর''।'

'ব্যস?'

'হ্যাঁ, তারপর পরবর্তী নোটেশন। কাঁকড়া বিছে, দুই আর তিন সংখ্যা, তারপর আবার...'

'জলপথে ভ্রমণ আর ভালবাসা আমার মানে কি?'

এভাবে ফলকের ধাঁধা নিয়ে গবেষণা চলল। রাতদিনের হিসাব ভুলে গেল ওরা, ঘুম আর খিদে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তারপর একদিন বাস্তব জগতে ফিরে এল সিঁড়ির গোড়া থেকে মারটিনের আওয়াজ ভেসে আসায়। ডেস্ক ছেড়ে দাঁড়াল রানা, আড়মোড়া ভেঙে হাতঘড়ি দেখল। 'আটটা বাজে। কিন্তু রাত নাকি দিন জানি না।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে মারটিন, তার কাপড়চোপড় ভেজা। 'তোমার এ অবস্থা কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সিঙ্ক-হোলে পড়ে গিয়েছিলে?'

হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল মারটিন। 'কেউ তোমাকে বলেনি? বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।'

নিমা আর রানা পরস্পরের দিকে আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। 'এত তাড়াতাড়ি?' ফিসফিস করল নিমা। 'আমাদের হিসেবে তো বর্ষা শুরু হতে আরও এক হপ্তা দেরি আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারটিন। 'ঋতুর পরিবর্তন হয় না?'

'অকাল বর্ষণ নয় তো?' জানতে চাইল রানা। 'নদীর কি অবস্থা? লেভেল উঠতে শুরু করেছে?'

'সে-কথা বলার জন্যেই তো এলাম। বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছি আমি, বাঘ গ্রুপটাকে নিয়ে। ওটার ওপর নজর রাখা দরকার। যদি দেখি বাঁধ ভেঙে পড়তে যাচ্ছে, একজন রানারকে পাঠাব। তখন কোন তর্ক বা সময় নষ্ট করো না, সেই মুহূর্তে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। আমার লোক পাঠানোর মানে হবে যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে বাঁধ।'

'টোরা নাবুকে সঙ্গে নিয়ো না,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওকে এখানে আমার দরকার।'

টানেল থেকে বেশিরভাগ শ্রমিককে নিয়ে চলে গেল মারটিন। রানা ও নিমা পরস্পরের দিকে তাকাল, দু'জনেই গম্ভীর।

'আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে, অথচ টাইটার ধাঁধার সমাধান করতে পারছি না,' বলল রানা। 'একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানবেন, নদীর লেভেল বাড়তে শুরু করলে...'

কথাটা নিমা শেষ করতে দিল না। 'নদী!' চেঁচিয়ে উঠল। 'সাগর নয়! অনুবাদে ভুল করেছি আমি। শব্দটার অনুবাদ করেছি– "জোয়ার"। ধরে নিয়েছিলাম টাইটা সাগরের কথা বলতে চাইছে। কিন্তু আসলে হবে স্রোত বা প্রবাহ। মিশরীয়রা দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।'

দু'জনেই ওরা ডেস্কে পড়ে থাকা নোটবুকের কাছে ছুটে এল। 'পড়ছি আবার–"পিছনে স্রোত আর মুখে বাতাস নিয়ে জলপথে ভ্রমণ করেছি..."।' মুখ তুলে নিমার দিকে তাকাল রানা।

'নীলনদে, জলপথে মানে নীলনদে,' বলল নিমা। 'জোরাল বাতাস সব সময় উত্তরদিক থেকে আসছে, আর স্রোত সব সময় দক্ষিণ দিক থেকে বয়। টাইটা উত্তর দিকে মুখ করে ছিল। উত্তর দুর্গ।'

'কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম উত্তরের প্রতীক বেবুন,' ওকে মনে করিয়ে দিল রানা।

'না! আমার ভুল হয়েছে!' অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নিমার চেহারা। 'শুনুন–"হে, ভালবাসা আমার, তোমার স্বাদ আমার ঠোঁটে মিষ্টি-মধুর"। মধু! মৌমাছি! উত্তর আর দক্ষিণের প্রতীকচিহ্ন আমি উল্টোপাল্টা করে ফেলেছিলাম।'

'আর পুব ও পশ্চিম? ওখানে কি পাচ্ছি আমরা?' নতুন উদ্যমে অনুবাদে মনোযোগ দিল রানা। 'পড়ছি–"আমার পাপ গোলাপের মতই টকটকে লাল। ওগুলো আমাকে বেঁধে রেখেছে ব্রোঞ্জের মত শেকল দিয়ে। ওগুলো আমার হৃদয়ে জ্বালাময়ী খোঁচা দেয়, এবং আমি চোখ ফেরাই সন্ধ্যা তারার দিকে"।'

'এখানে কি ভুল করলাম বুঝতে পারছি না...'

'খোঁচা শব্দটা ভুল অনুবাদ,' বলল রানা। 'হওয়া উচিত বিদ্ধ করে বা কামড় দেয়। কাঁকড়া বিছে কামড় দেয়। কাঁকড়া বিছে তাকিয়ে আছে সন্ধ্যা তারার দিকে। সন্ধ্যা তারা সব সময় পশ্চিমে দেখা যায়। কাঁকড়া বিছে হলো পশ্চিম দুর্গ, পুবদিকের দুর্গ নয়।'

'বোর্ডটাকে উল্টো করে দেখতে হবে!' উত্তেজনায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল নিমা। 'চলুন নতুন নিয়মে খেলি।'

'লেভেল সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসিনি আমরা,' প্রতিবাদ করল রানা। 'সিস্ট্রাম কি আপার লেভেল, নাকি তিন তলোয়ার?'

'ব্রেকথ্রু যখন ঘটেছে, এটা ধরেই এগোতে হবে আমাদের। সিস্ট্রামকে আপার লেভেল ধরে খেলব আমরা, তাতে কাজ না হলে আরেক ভাবে চেষ্টা করা যাবে।'

কাজটা আগের চেয়ে সহজ লাগল। বহুবার আসা-যাওয়া করায় পরিচিত হয়ে উঠেছে, এখন আর আগের মত গা ছমছমও করে না। টানেলের প্রতিটি কোণে, মোচড়ে, বাঁকে আর টি-জাংশনে রানার হাতের চক দিয়ে লেখা চিহ্ন রয়েছে। জটিল বাঁক আর মোচড় ঘুরে দ্রুত এগোতে পারছে ওরা। প্রতিটি নোটেশন অনুসরণ করে এগোতে পারছে দেখে উৎসাহ আর উত্তেজনা বেড়ে গেল, সামনে কোন বাধা পাচ্ছে না।

'আঠারোতম চাল,' কেঁপে গেল নিমার গলা। 'এটা যদি আমাদেরকে খোলা ফাইলগুলোর একটায় নিয়ে যেতে পারে, যেটা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দুর্গের জন্যে হুমকি, তাহলে সেটা হবে চেক কু।' বড় করে শ্বাস টানল ও। 'পাখি। তিন আর পাঁচ নম্বর। সঙ্গে লোয়ার লেভেলের প্রতীক তিন তলোয়ার।'

গুনে গুনে পা ফেলে পাঁচটা জাংশন পেরিয়ে এল ওরা, নেমে এল গোলকধাঁধার সবচেয়ে নিচের লেভেলে, প্রতিটি মোড়ের পাথরের ব্লকে চক দিয়ে আঁকা চিহ্নগুলো পড়ে নিজেদের পজিশন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে।

'এটাই!' নিমাকে বলল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনে, নিজেদের চারদিকে তাকাল।

'অসাধারণ কিছুই এখানে নেই,' নিমার গলায় হতাশার সুর। 'এর আগে অন্তত পঞ্চাশবার এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করেছি আমরা। এটাও আর সব বাঁকের মত।'

'টাইটা চেয়েছেও তাই, আমরা যাতে পার্থক্যটা বুঝতে না পারি।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' এই প্রথম দিশেহারা দেখাল নিমাকে।

'ফলকের শেষ লেখাটা পড়ুন তো।'

হাতের নোটবুক খুলল নিমা। 'পড়ছি–"মিশরের এই পবিত্র আর কালো মাটিতে ফসলের কোন কমতি নেই। আমি আমার গাধার পাঁজরে চাবুক মারলাম, লাঙলের কাঠের ফলা নতুন জমিন গুঁড়ো করল। আমি বীজ বপন করলাম, ঘরে তুললাম আঙুর আর শস্যদানা। সময় মত আমি মদ্য পান করলাম আর রুটি খেলাম। মরশুমের ছন্দ মেনে চলি আমি, জমিনের যত্ন নিই"।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিমা। 'মরশুমের ছন্দ? টাইটা কি ফলকের

চারটে মুখের কথা বলছে? জমিন?' প্রশ্ন করে পায়ের সামনে পাথরের দিকে তাকাল। 'জমিন কি পায়ের নিচে নয়, রানা?'

পাথরের ফলকে পা ঠুকল রানা, কিন্তু আওয়াজটা হলো ভোঁতা আর নিরেট। 'জানার একটাই উপায় আছে।' তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক ছাড়ল, 'নাবু! এদিকে এসো!'

বৃষ্টির মধ্যে হলুদ ফ্রন্ট এন্ড লোডার-এর উঁচু সীটে বসে বাঘ গ্রুপটাকে গালিগালাজ করছে মারটিন, আবার হাসছেও, কারণ জানে তার গালাগালির একটা শব্দও ওরা বুঝতে পারছে না। ইতিমধ্যে বৃষ্টির মাত্রা কমে গেছে, তবে পাহাড় চূড়ার মাথায় বিশাল এলাকা জুড়ে কালো আর ভারী হয়ে আছে মেঘ। সত্যিকার অর্থে বর্ষা মরশুম শুরু হয়নি; প্রবল বাতাস বইছে, মেঘগুলো সরে গেলেও যেতে পারে।

তবে নদী ওপরে উঠছে। বাতাস থেমে গেলে তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে। তখনকার বিপদের কথা ভেবেই বাঁধের ওপর গ্যাবিয়ন ফেলে আরও উঁচু করা হচ্ছে ওটা। জালে পাথর ভরা হচ্ছে, বাঘের বাচ্চারা সেগুলো বয়ে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখছে, মারটিন সেগুলো তার ট্র্যাক্টরের ক্রেনে তুলে নিয়ে বাঁধের মাথায় নামাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, নদীর পানিকে কোনভাবেই বাঁধের মাথায় উঠতে দেয়া যাবে না। তা যদি একবার উঠতে পারে, এই বাঁধ খড় কুটোর মত ভেসে যাবে, কারও সাধ্য নেই ঠেকিয়ে রাখে। আর বৃষ্টি যদি একবার শুরু হয়, নদীকে বশে রাখাও সম্ভব হবে না।

মারটিন জানে বিপদ ঘটতে শুরু করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না, কারণ তখন রানাকে খবর পাঠিয়েও কোন লাভ নেই। বাঁধ ভাঙা পানির সঙ্গে দৌড়ে রানার কাছে আগে পৌঁছুতে পারবে না কোন রানার। ব্যাপারটা এখন সূক্ষ্ম বিবেচনার। ওর সতর্ক মন বলছে, রানাকে সাবধান করার এখনই সময়। টানেল থেকে এখুনি ওদের বেরিয়ে আসা উচিত।

তবে এ-ও মারটিন জানে যে টানেলের ভেতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে ওরা, সময়ের আগে টানেল থেকে ডেকে নিলে ক্ষতি তো হবেই, তার ওপর রেগেও যাবে রানা।

মারটিন সিদ্ধান্ত নিল, নদীর ওপর নজর রেখে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবে সে। নদীর কিনারা ধরে ট্র্যাক্টর নিয়ে এগোল, আরেকটা গ্যাবিয়ন নামাবে বাঁধের মাথায়।

টোরা নাবু আর তার কয়েকজন লোকের সঙ্গে রানাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। গোলকধাঁধার এটা সবচেয়ে নিচের লেভেল, মেঝে থেকে একটা একটা করে তুলে ফেলা হচ্ছে প্যাব বা ফলক। ওগুলোর মাঝখানের জয়েন্ট এত আঁটসাঁট যে এমন কি ক্রো-বার দিয়ে আলাদা করতেও হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা। সময় বাঁচানোর জন্যে নিজেদের তৈরি পেজ-হ্যামার দিয়ে ফলকগুলো ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে হলো রানাকে।

শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও, সবারই চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ লেগে আছে, কারণ তারা জানে গিরিখাদের মাথায় নদীর লেভেল ওপরে উঠতে শুরু করেছে। রানার জন্যে খারাপ খবর হলো, টোরা নাবুর ষোলোজন শ্রমিক ডিউটিতে আসেনি। সন্দেহ নেই, পালিয়েছে তারা।

টানেলের বাঁক থেকে ফলক ভাঙতে শুরু করেছে ওরা। ভাঙা হচ্ছে বাঁকের দু'দিকের মেঝেই। একটা করে ফলক ভাঙা হয়, নিচে কোন দরজা বা ধাপ দেখার আশায় দম ধরে রাখে রানা। কিন্তু হতাশ হতে হয়, নিচে নিরেট পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

কাজ থামিয়ে পানি খেতে এসে নিমাকে বলল ও, 'আশা করার মত কিছু দেখছি না।'

নিমা উত্তরে কিছু বলার আগেই নাবুর চিৎকার ভেসে এল, 'স্যার, দেখে যান!'

হাত থেকে পানির ফ্লাস্কটা ফেলে দিয়ে ছুটল নিমা, খেয়ালই করল না যে ওটা ভেঙে গিয়ে ওর পা ভিজিয়ে দিল। নাবুর পাশে এসে দাঁড়াল সে। হ্যামার ওপর তুলে আরেকটা আঘাত করার জন্যে তৈরি নাবু। 'কি…কি…,' থেমে গেল নিমা, ইতিমধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে রানাও। দু'জনেই দেখল, সদ্য ভাঙা একটা ফলকের নিচে সাধারণ কোন পাথর নয়, ড্রেস করা আরেকটা ফলক রয়েছে।

তারপর দেখা গেল সাজানো ফলকের আরও একটা স্তর রয়েছে মেঝের নিচে, টানেলের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলকগুলো চারপাশের পাথরের সঙ্গে জোড়া লাগানো, জয়েন্টগুলো এত সরু যে প্রায় চোখেই পড়ে না। কিনারাগুলো মসৃণ ও সমান, কোন রকম খোদাই বা চিহ্ন নেই। 'কি ব্যাপার, রানা?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'বোঝাই যাচ্ছে, আরেকটা স্তর, নিচে হয়তো কোন ফাঁক আছে। না তোলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।'

দ্বিতীয় স্তরের ফলক এত চওড়া আর শক্ত যে ওদের হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা সম্ভব হলো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে প্রথম ফলকের চারধারে জয়েন্ট বরাবর গভীর খাল কেটে আলাদা করতে হলো প্রথমে, তারপর তুলে ফেলা হলো। ভিত থেকে একটা প্রান্ত তুলতে পাঁচজন লোককে হাত লাগাতে হলো।

'ফলকটার নিচে একটা ফাঁক আছে।' হাঁটু গেড়ে উঁকি দিল নিমা। 'খোলা শ্যাফটের মত।'

একটা ফলক তোলার পর বাকিগুলো তোলার কাজ সহজ হয়ে গেল। অবশেষে চৌকো ফাঁকটার সবটুকু উন্মোচিত হলো। অন্ধকার শ্যাফটের ভেতর ল্যাম্পের আলো ফেলল রানা। ভেতরের ফাঁক টানেলের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, নিচের প্রথম ধাপে পা রাখার পর সিধে হয়ে দাঁড়াতে রানার কোন অসুবিধে হলো না, বাকি ধাপগুলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁক নিয়ে নেমে গেছে। 'আরেকটা সিঁড়ি,' বলল ও। 'বোধহয় এটাই সেটা। ভুল পথ দেখাতে দেখাতে এমন কি টাইটারও এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা।'

শ্রমিকরা সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তবে জানে বোনাস হিসেবে অতিরিক্ত

সিলভার ডলার পাবে তারা।

'আমরা কি এখুনি নিচে নামছি?' জানতে চাইল নিমা। 'জানি ফাঁদ থাকতে পারে, সাবধান হওয়া দরকার; কিন্তু সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে।'

'ফাঁদ থাকুক আর নাই থাকুক, আজ আমাদের ঝুঁকি নেয়ার দিন,' বলল রানা।

পাশাপাশি নামছে ওরা। প্রতিবার সাবধানে একটা করে পা ফেলছে। হাতের ল্যাম্প মাথার ওপর উঁচু করে ধরেছে রানা। নিমা বলল, 'নিচে একটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে স্টোররুম,' ফিসফিস করল রানা। 'দেয়াল ঘেঁষে সাজানো কি ওগুলো?' সংখ্যায় কয়েকশো হবে। 'কফিন, সারকফাগাস?' গাঢ় আকৃতিগুলো প্রায় মানুষেরই আদল, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক অনেকগুলো সারি। চেম্বারটা চৌকো।

'না,' বলল নিমা। 'একদিকে ওগুলো শস্য রাখার বাস্কেট, আমি চিনতে পারছি। আরেকদিকে দুই হাতলঅলা জার, মদ রাখার জন্যে। সম্ভবত মৃত লোককে দান করা হয়েছে।'

'এটা যদি ফিউনারাল স্টোররুম হয়ে থাকে,' উত্তেজনায় আঁটসাঁট গলায় বলল রানা, 'ধরে নিতে হয় সমাধির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।'

'হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল নিমা। 'দেখুন–স্টোররুমের শেষ মাথায় একটা দরজা। ওদিকে আলো ফেলুন!'

চেম্বারের এক প্রান্তে ফাঁকটা দেখা গেল, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের। শেষ ধাপ ক'টা ছুটে পার হলো ওরা। কিন্তু স্টোররুমের লেভেল ফ্লোরে পৌঁছুতেই অদৃশ্য একটা বাধা থামিয়ে দিল ওদেরকে। ছিটকে পিছন দিকে পড়ল দু'জনেই।

'ও আল্লাহ!' নিজের গলা খামচে ধরেছে রানা, কর্কশ শোনাল আওয়াজটা। 'পিছিয়ে আসুন! পিছিয়ে আসুন!'

হাঁটু গেড়ে প্রায় ঢলে পড়ার অবস্থা হলো নিমার, বাতাসের অভাবে সে-ও ভুগছে। 'রানা!' চিৎকার দিতে চাইছে, কিন্তু সমস্ত বাতাস আটকে গেছে ফুসফুসে। বুকে প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করছে ও। 'রানা! আমাকে বাঁচান!' দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার অবস্থা হয়েছে ওর, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে।

নিমার ওপর ঝুঁকল রানা, দু'হাতে ধরে তুলতে চেষ্টা করল। পারছে না, সাংঘাতিক কাহিল লাগছে নিজেকে। পা দুটো হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, নিজের ওজনই বইতে পারছে না। ও জানে, দম আটকে মারা যাচ্ছে ওরা। চার মিনিট, ভাবল ও। চার মিনিটের মধ্যে তাজা বাতাস না পেলে মৃত্যু ঘটবে মস্তিষ্কের।

নিমার পিছনে দাঁড়াল রানা, ওর বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে হাত দুটো এক করল, তারপর আবার ওকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। পিছন দিকে ঢলে পড়ছে ও, ধাপের ওপর। সমস্ত মনোবল এক করে নিজেকে স্থির রাখতে চাইছে। আবার নিমাকে তুলতে চেষ্টা করল। কিভাবে পারল বলতে পারবে না, শুধু খেয়াল করল ধাপ বেয়ে পিছু হটছে ও, বুকের সঙ্গে

লেপ্টে রয়েছে নিমা। প্রতিটি পা ফেলতে অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি লাগছে। আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে নিমা, রানার বৃত্তাকার বাহুবন্ধনে ঝুলছে, অসাড় পা দুটো পাথুরে ধাপের ওপর ঘষা খাচ্ছে।

চিৎকার করতে চাইছে রানা, নাবুকে বলতে চাইছে সাহায্য করো। কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজই বের করতে পারল না। আরও পাঁচ ধাপ উঠে এল। বুঝতে পারছে, নিমার ভার বহন করা ওর পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে এ-ও জানে, ওকে যদি এখানে ফেলে যায়, কিছুতেই বাঁচবে না। আরও পাঁচ ধাপ উঠল। তারপর পড়ে গেল রানা। ধাপের ওপর আড়ষ্টভঙ্গিতে শুয়ে আছে, বুকের ওপর নিমা। 'শ্বাস নিতে দাও, আল্লাহ শ্বাস নিতে দাও!' গলায় আওয়াজ নেই, শুধু ঠোঁট দুটো নড়ছে। 'প্লীজ, গড...'

যেন ওর প্রার্থনা শুনেই ছুটে এল তাজা বাতাস, নাক-মুখ গলে ফুসফুসে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শক্তি ফিরে এল। নিমাকে আবার জড়িয়ে ধরল রানা, সিধে হলো টলতে টলতে। এবার সিঁড়ির মাথার দিকে মুখ করে উঠছে রানা, ফাঁকটার মাথায় পৌঁছে গেল, টোরা নাবুর পায়ের কাছে।

'কি ব্যাপার, স্যার? কি হয়েছে আপনাদের?' উদ্বিগ্ন নাবু জানতে চাইল।

টানেলের মেঝেতে নিমাকে শুইয়ে দিল রানা, জবাব দেয়ার শক্তি নেই। নিমার গালে চাপড় মারল ও। 'কথা বলুন, নিমা! কথা বলুন!'

নিমা সাড়া দিচ্ছে না। কাজেই ওর ওপর ঝুঁকল রানা, মুখটা নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরল, ফুঁ দিল ভেতরে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, নিমার বুক ফুলছে।

মাথা তুলল রানা, তিন পর্যন্ত গুনল। 'প্লীজ, ডার্লিং, প্লীজ! শ্বাস নিন!' মড়ার মত চেহারায় কোন রঙ ফুটছে না। আবার ঝুঁকল ও, মুখে মুখ চেপে ফুঁ দিল। নিমার ফুসফুস ভরে গেল আবার, এবার রানার নিচে নড়ে উঠল ও। 'গুড গার্ল! লক্ষী মেয়ে!'

তৃতীয় বার ফুঁ দেয়ার পর রানাকে ঠেলে নিজের ওপর থেকে সরিয়ে দিল নিমা, আড়ষ্টভঙ্গিতে উঠে বসল, বোকার মত তাকাল চারদিকে। রানার ওপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'রানা, কি ঘটেছে?'

'ঠিক জানি না। তবে দু'জনেই মারা যাচ্ছিলাম। এখন কেমন লাগছে আপনার?'

'মনে হচ্ছিল অদৃশ্য একটা হাত আমার গলা চেপে ধরেছে। শ্বাস নিতে পারছিলাম না, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'প্যাসেজের লোয়ার লেভেলে কোন ধরনের গ্যাস আছে। আপনি অজ্ঞান ছিলেন মিনিট দুয়েক।'

কপালে হাত দিল নিমা। 'ব্যথা করছে। শুনতে পাচ্ছিলাম আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আপনি আমাকে ডার্লিং বলেছেন...নাকি ভুল শুনলাম?'

'সামান্য পিপ অভ টাং,' হাত ধরে নিমাকে দাঁড় করাল রানা। তারপরও টলছে ও, হেলান দিল রানার গায়ে।

'ধন্যবাদ, রানা। ঋণের বোঝা শুধু বাড়ছেই। জানি না কোনদিন শোধ করতে পারব কিনা।'

'সে দেখা যাবে।' স্মিত হাসি লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে।

হঠাৎ নিমা খেয়াল করল, চারপাশের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রানার গা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও। 'কি ধরনের গ্যাস, রানা? গ্যাস ওখানে এলোই বা কোত্থেকে? আপনার কি ধারণা, এটাও টাইটার আরেকটা চালাকি?'

'সম্ভবত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেনও হতে পারে। মিথেনও তো বাতাসের চেয়ে ভারী, তাই না?'

'এল কোত্থেকে?'

'পচা লাশ থেকে তৈরি হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে ওই বাস্কেট আর জারগুলোকে সন্দেহ হচ্ছে আমার। ওগুলোর ভেতরে কি আছে জানার পর বুঝতে পারব।' কেমন লাগছে এখন? মাথার ব্যথাটা কমেছে?'

'আমি ভাল আছি। এখন আমরা কি করব, রানা?'

'চেম্বার থেকে গ্যাস পরিষ্কার করতে হবে,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

শ্যাফটের গ্যাস লেভেল পরীক্ষা করার জন্যে মোমবাতি ব্যবহার করল রানা। ডান হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামছে। নামার সময় হাতের বাতিটা মেঝের দিকে নিচু করল, প্রতিবার এক ধাপ করে নামছে। ভালই জ্বলছে বাতি, নাচানাচি করছে শিখাটা। তারপর চেম্বারের মেঝে থেকে ছ'টা ধাপ ওপরে থাকতে, শিখাটা হলুদ হয়ে গেল, নিভে গেল দপ করে। দেয়ালে চক দিয়ে দাগ কাটল রানা। 'না, মিথেন নয়,' বলল ও। 'কার্বন ডাইঅক্সাইডই।'

শ্যাফটের মাথা থেকে নিমা বলল, 'মিথেন হলে বুঝি বিস্ফোরণ ঘটত?' হেসে উঠল ও।

'নাবু, ব্লোয়ার ফ্যানটা নিয়ে এসো,' বলল রানা।

হাতে ফ্যানটা নিয়ে দম আটকাল রানা, নিচের ধাপটায় নেমে এসে চেম্বারের মেঝেতে রাখল ওটা। ফ্যান চালু করেই ছুটে ফিরে এল দেয়ালে দাগ কাটা জায়গাটার ওপরে। নিমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, 'পনেরো মিনিট পর পর টেস্ট করতে হবে।'

গ্যাস সরাতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। চেম্বারে নেমে এখন ওরা শ্বাস নিতে পারছে। রানার নির্দেশে কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে এল নাবু, চেম্বারের মাঝখানে আগুন জ্বালা হলো। আঁচ পেয়ে বাতাস আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। এরপর নিমাকে নিয়ে বাস্কেটগুলো পরীক্ষা করল রানা।

'ব্যাটা অতি চালাক!' বলল রানা। 'নানা জিনিস মিশিয়ে সার তৈরি করে রেখে গেছে।'

চেম্বারের আরেক দিকে চলে এল ওরা, মাটির একটা জার কাত করে খানিকটা পাউডার ঢালল মেঝেতে। আঙুলে নিয়ে ঘষা দিল রানা, তারপর শুঁকল। 'লাইমস্টোনের গুঁড়ো। অনেক আগে শুকিয়ে যাওয়ায় গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে, তবে টাইটা সম্ভবত কোন ধরনের অ্যাসিডে ভিজিয়ে রেখেছিল। সম্ভবত ভিনিগার, আবার প্রস্রাবও হতে পারে। এ থেকেই কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে।'

'তারমানে এটাও তাহলে একটা ফাঁদ ছিল,' বলল নিমা।

'এত হাজার বছর আগেও টাইটা পচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানত। ওই মিশ্রণ থেকে কি ধরনের গ্যাস তৈরি হবে জানা ছিল তার। ব্যাটাকে বিরাট কেমিস্ট বলতে আমার আপত্তি নেই।'

'আর বাতাস যেহেতু এখানে স্থির, এ-ও জানত যে চেম্বারের মেঝেতে ভেসে থাকবে গ্যাস, ওপরে উঠবে না। আমি ধরে নিচ্ছি এই শ্যাফটের ডিজাইন করা হয়েছে একটা ইউ-ট্র্যাপ-এর আদলে। বাজি ধরে বলতে পারি, ওই প্যাসেজও ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে...,' হাত তুলে আরেক প্রান্তের দরজা বা ফাঁকটা রানাকে দেখাল নিমা। 'প্রথম ধাপটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমি।'

চার

নদীর কিনারায় পাথরের উঁচু স্তূপ তৈরি করেছে মারটিন, লেভেল মনিটর করার জন্যে। ওগুলোর ওপর কড়া নজর আছে তার।

বৃষ্টি বন্ধ হবার পর ছ'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। পাহাড় চূড়ার মেঘ সরে গেছে, তবে উত্তর দিগন্তে নতুন করে জমা হচ্ছে আবার। ওদিকে, হাইল্যান্ডে, যে-কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হবে। তা যদি হয়, মারটিন ভাবছে, এখানে অ্যাবে গিরিখাদে বন্যার পানি পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।

ট্রাক্টর থেকে নেমে নদীর পাড় ধরে নিচে নামল সে, স্টোন মার্কার পরীক্ষা করবে। গত এক ঘণ্টায় পানির লেভেল এক ফুটের মত নেমেছে। তবে নিজেকে খুশি হতে নিষেধ করল সে-কারণ, নদীর লেভেল এক ফুট উঁচু হতে মাত্র পনেরো মিনিট লেগেছিল। চূড়ান্ত বর্ষণ আসন্ন। অমোঘ নিয়তির মত, এড়াবার উপায় নেই। নদী ফুলে-ফেঁপে উঠবে। বিস্ফোরিত হবে বাঁধ। ভাটির দিকে ফিরে বাঁধটা দেখল সে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

চরম মুহূর্তটা পিছিয়ে দেয়ার জন্যে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব, করেছে মারটিন। বাঁধের পাঁচিল প্রায় চার ফুট উঁচু করেছে সে। পাঁচিলের পিছনে আরেক প্রস্থ অবলম্বন তৈরি করেছে, বাঁধটাকে আরও খানিক পোক্ত করার জন্যে। আর কিছু করার নেই তার। এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারে।

পাড় বেয়ে উঠে এসে হলুদ ট্রাক্টরের গায়ে হেলান দিল মারটিন, শ্রমিকদের দিকে তাকাল। রণক্লান্ত সৈনিকদের মত লাগছে ওদেরকে। নদীকে ঠেকিয়ে রাখতে আজ দু'দিন ধরে খাটছে ওরা, প্রত্যেকেই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ওদেরকে আবার কাজ করতে বলাটা হবে অমানবিক। এরপর নদী হামলা করলে পরাজয় মেনে নিতে হবে।

কয়েকজন শ্রমিক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে বসে উজানের দিকে তাকাল। বাতাসে অস্পষ্টভাবে ভেসে এল তাদের গলা। কিছু একটা কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে তুলেছে তাদেরকে। ট্রাক্টরের ওপর উঠে কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকাল মারটিন। এসকার্পমেন্টের দিক থেকে ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে পরিচিত একজন

মানুষ। ক্যামো ফেটিগ পরা, হাঁটার ভঙ্গিতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। অ্যালান শাফি। তার সঙ্গে দু'জন কোম্পানী কামান্ডারও রয়েছে।

কাছাকাছি এসে শাফি জানতে চাইল, 'মারটিন, তোমার বাঁধের খবর কি? পাহাড়ে বৃষ্টি শুরু হতে যাচ্ছে। নদীটাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে তো মনে হয় না।'

ট্র্যাক্টর থেকে লাফ দিয়ে নেমে শাফির সঙ্গে করমর্দন করল মারটিন। 'তুমি যেমন রানার বন্ধু, আমিও তেমনি। বন্ধুর জন্যে যতটুকু পারা যায় করছি। তবে তোমার কথাই ঠিক, ডানডেরাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।'

'আমি শুধু নদীকে নিয়ে চিন্তিত নই,' বলল শাফি। 'খবর পেয়েছি সরকারী বাহিনী হামলা করার জন্যে পজিশনে চলে আসছে। আমার কাছে তথ্য আছে, ডেবরা মারিয়াম থেকে পুরো একটা ব্যাটালিয়ন রওনা হয়েছে। আরেকটা ফোর্স আসছে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠের নিচে থেকে, উঠে আসছে অ্যাবে রিভার ধরে।'

'সাঁড়াশি আক্রমণ, তাই না?'

'আমরা সংখ্যায় কম,' বলল শাফি। 'আক্রমণ শুরু হলে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব জানি না। আমার লোকেরা গেরিলা, সেট-পিস ব্যাটলে অভ্যস্ত নয়। আমাদের কৌশল হলো হিট অ্যান্ড রান। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, নোটিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পালাবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'আমার জন্যে তোমাকে বেশি চিন্তা করতে হবে না, ছুটে পালাতে ওস্তাদ আমি। রানা আর মিস নিমাকে নিয়ে চিন্তা করো, টানেলের ভেতর না আটকা পড়ে।'

'ওদের কাছেই যাচ্ছি,' বলল শাফি। 'একটা ফল-ব্যাক পজিশনের ব্যবস্থা করতে চাই। যুদ্ধ শুরুর পর আমরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, আবার আমাদের দেখা হবে মঠে লুকানো বোটের কাছে।'

'ঠিক আছে, শাফি-' হঠাৎ থেমে গেল মারটিন, চারজনই ওরা মুখ তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাল। পাড়ের কাছে লোকজনকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'কি ব্যাপার?'

'আমার একটা পেট্রল ফিরে আসছে।' চোখ সরু করল শাফি। 'নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটেছে।' তারপরই তার চেহারা বদলে গেল। গেরিলারা একটা স্ট্রেচার বয়ে আনছে। স্ট্রেচারে কাত হয়ে রয়েছে ছোট ও হালকা একটা দেহ।

শাফিকে ছুটে আসতে দেখে স্ট্রেচারের ওপর উঠে বসল রুবি। স্ট্রেচারটা মাটিতে নামিয়ে রাখল গেরিলারা। সেটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শাফি, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রুবিকে। কথা না বলে পরস্পরকে অনেকক্ষণ ধরে থাকল ওরা। তারপর রুবির মুখটা দু'হাতের তালুতে ভরে ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখল শাফি। গোটা মুখ ফুলে উঠেছে, এরইমধ্যে পুঁজ জমেছে কয়েকটা ক্ষতের মুখে। চোখের পাতায় ফোস্কা পড়েছে। 'কে করল? কার কাজ?' নরম সুরে জানতে চাইল সে।

পোড়া ঠোঁট নাড়ল রুবি, আবেগে আর অভিমানে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুল শুধু। তারপর বলতে পারল, 'ওরা আমাকে সব কথা···'

'না, কথা বলো না,' বাধা দিল শাফি, দেখল রুবির নিচের ঠোঁট ফেটে গিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। 'তোমার দোষ নেই।'

'বাধা দিয়ো না, আমাকে বলতে হবে,' ফিসফিস করল রুবি। 'ওরা আমাকে কথা বলতে বাধ্য করেছে। তোমার গেরিলাদের সংখ্যা, এখানে রানার সঙ্গে তুমি কি করছ, সব কথা বলে ফেলেছি। দুঃখিত, শাফি। আমি তোমার সঙ্গে বেঈমানী করেছি···'

'কে দায়ী? কে তোমার এই অবস্থা করল?'

'কর্নেল ঘুমা আর প্রক্সির আমেরিকান লোকটা, রাফেল।'

আলতো আলিঙ্গনে আবার রুবিকে জড়াল শাফি, তবে তার চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে।

টানেলের লোয়ার চেম্বার পুরোপুরি গ্যাসমুক্ত হয়েছে। মেঝের মাঝখানে এখনও জ্বলছে আগুনটা, উত্তপ্ত বাতাস সিঁড়ি হয়ে ওপরের টানেলে বেরিয়ে গেছে, অক্সিজেন-সমৃদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে মিশে গ্যাস তার ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে নিমা, রানার পিছু নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ও।

চল্লিশটা ধাপ বেয়ে চেম্বারটায় নেমেছিল ওরা, হুবহু একই রকম আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। ওদের মাথা চল্লিশতম ধাপের সঙ্গে একই লেভেলে আসার পর হাতের ল্যাম্পটা উঁচু করে সামনে কি আছে দেখার চেষ্টা করল রানা। সুবিশাল এক তোরণের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল আলো, রঙিন সব বিচিত্র আকৃতি আর নকশায় ধাঁধিয়ে গেল ওদের চোখ, যেন বৃষ্টির পর মরুভূমির একটা মাঠে অপরূপ সব ফুল ফুটেছে। গম্বুজ আকৃতির জায়গাটার চারদিকের দেয়ালে বিচিত্র সব পেইন্টিং, এত সুন্দর আর নিখুঁত যে দম বন্ধ হয়ে এল।

'টাইটা!' ভাঙা ও কাঁপা আওয়াজ বেরুল নিমার গলা থেকে। 'এগুলো তার আঁকা। টাইটার বৈশিষ্ট্যই আলাদা, চিনতে আমি ভুল করি না। তার কাজ যেখানেই দেখি, চিনতে পারব।'

ওপরের ধাপটায় দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তিনদিকে তাকাচ্ছে ওরা। এগুলোর তুলনায় লম্বা গ্যালারির দেয়ালচিত্র ম্লান তো বটেই, অনুকরণ দোষেও দূষিত। এগুলো মহান এক শিল্পীর কাজ, কালজয়ী প্রতিভার, যার শিল্পকর্ম চার হাজার বছর পরও মানুষকে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিতে পারে।

ওরা খুব ধীর পায়ে সামনে এগোল, প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে। তোরণ পেরিয়ে আসার পর দেখল দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি খুদে চেম্বার রয়েছে, প্রাচ্যের বাজারগুলোয় যেমন ছোট দোকান-ঘর দেখা যায়। প্রতিটি দোকানের প্রবেশমুখে পাহারা দিচ্ছে লম্বা স্তম্ভ, উঁচু হয়ে ছাদ ছুঁয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভ দেবতাদের একেকটা স্ট্যাচু। স্ট্যাচুগুলোই আসলে গম্বুজ আকৃতির সিলিংটাকে মাথায় করে রেখেছে।

প্রথম দুটো দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, চাপ দিল নিমার বাহুতে। ফিসফিস করে বলল, 'ফারাও-এর ট্রেজার চেম্বার।' চেম্বার বা

দোকানগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত অদ্ভুত সুন্দর সব জিনিসে ঠাসা।

'এগুলো ফার্নিচার স্টোর,' বিড়বিড় করল নিমা। চেয়ার, টুল, খাট আর ডিভানের আকৃতি স্পষ্ট চিনতে পারছে ও। কাছের স্টলের সামনে চলে এল, হাত বাড়িয়ে রাজকীয় একটা সিংহাসন ছুঁলো। একেকটা বাহু পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকা একজোড়া করে সরীসৃপ, ব্রোঞ্জ আর ল্যাপিস ল্যাজুলাই দিয়ে তৈরি। পায়াগুলো সোনা দিয়ে তৈরি সিংহের থাবা। সীট আর পিঠে শিকার ধাওয়া করার দৃশ্য আঁকা হয়েছে। পিঠের মাথায় সোনার তৈরি একজোড়া ডানা।

সিংহাসনের পিছনে সাজানো রয়েছে অসংখ্য ফার্নিচার। জালি দিয়ে ঢাকা একটা ডিভান চিনতে পারল ওরা, জালিটা আবলুস কাঠ আর আইভরি দিয়ে তৈরি। তবে ডজন ডজন আরও বহু জিনিস রয়েছে, বেশিরভাগই বিভিন্ন অংশ খুলে আলাদা করা, ফলে কোনটা যে কি চেনা গেল না। প্রতিটি অংশ দামী মেটাল আর রঙিন রত্নখচিত, তাকালেই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। তোরণের দু'পাশে সারি সারি ছোট আকৃতির কুলুঙ্গি দেখা গেল, সেগুলো আশ্চর্য সুন্দর কালেকশনে ভরা। প্রতি জোড়া কুলুঙ্গির মাঝখানে 'বুক অভ দ্য ডেড' থেকে নেয়া উদ্ধৃতি লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে তোরণসমূহ পেরিয়ে ফারাও-এর ভ্রমণ কাহিনীর বিবরণ, ট্রেইলে কত রকমের বিপদ ওত পেতে ছিল, দৈত্য আর দানবরা কিভাবে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'লম্বা গ্যালারির নকল সমাধিতে এই পেইন্টিং ছিল না,' রানাকে বলল নিমা। 'একবার শুধু রাজার মুখের দিকে তাকান। বুঝতে পারবেন উনি সত্যিকার একজন বাস্তব চরিত্র ছিলেন।'

ওদের পাশের দেয়ালচিত্রে দেখা যাচ্ছে মহান দেবতা অসিরিস ফারাও-এর হাত ধরে পথ দেখাচ্ছেন, কাছে সরে আসা দানবদের কবল থেকে রক্ষা করছেন তাঁকে।

'ফিগারগুলো দেখুন,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'আড়ষ্ট কাঠের পুতুলের মত নয়, সব সময় ডান পা বাড়িয়ে রেখেছে। এগুলো বাস্তবে দেখা পুরুষ ও নারী। প্রতিটি ফিগার অ্যানাটমিক্যালি কারেক্ট। শিল্পী হিউম্যান বডি স্টাডি করেছেন, শারীরিক কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তাঁর।'

পাশের দেয়ালের আরেক খুপরির সামনে থামল ওরা। ভেতরে অস্ত্র আর যুদ্ধের সরঞ্জাম দেখা গেল। রথের প্যানেলগুলো সোনার তৈরি পাতা দিয়ে ঢাকা, ফলে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাইড প্যানেলে, প্রতিটি লম্বা চাকার পিছনে, সাজানো রয়েছে তীর আর বর্শা। রথের পাশে রয়েছে স্তূপ করা ছোরা আর আইভরির হাতলসহ তলোয়ার, ফলাগুলো চকচকে ব্রোঞ্জ। র‍্যাকে রাখা হয়েছে বল্লম। ঢালগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি, ঢালের গায়ে যুদ্ধবিজয়ের দৃশ্য, সঙ্গে স্বর্গীয় মামোসের প্রতিকৃতি আঁকা। কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি হেলমেট আর ব্রেস্টপ্লেট দেখল ওরা।

পাশাপাশি পাঁচটা খুদে চেম্বারে রয়েছে পাঁচটা যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল। প্রতিটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে শত শত সৈন্য রথ নিয়ে আক্রমণের জন্যে তৈরি। সৈনিক, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র সবই স্বর্ণের। প্রতিটি মূর্তি বা আকৃতির গায়ে ফারাও-এর নাম

খোদাই করা। এই পাঁচটা দোকান বা স্টোর দেখে এতই বিহ্বল হয়ে পড়ল নিমা, রানার গায়ে হেলান দিতে বাধ্য হলো, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। একটা স্টোরে সৈন্য সংখ্যা গুনতে শুরু করল রানা, কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এভাবে সম্ভব নয়, বের করে গুনতে হবে—পরে।'

'কত ভরি ওজন একজন সৈনিকের?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল নিমা।

একটা মূর্তি হাতে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল রানা। 'পনেরো থেকে বিশ ভরির কম নয়,' বলল ও।

'কয়েক হাজার সৈন্য, তাই না?' আবার ফিসফিস করল নিমা।

'সৈন্য, সেবিকা, ঘোড়া, রথ, অস্ত্র, ঢাল, পানপাত্র—সব মিলিয়ে আনুমানিক ত্রিশ হাজার পিস।'

'দাম···না, থাক!' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল নিমা।

'সোনার দাম এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়,' বলল রানা। 'প্রত্ন নিদর্শন হিসেবে মূল্য ধরতে হবে। প্রতিটি মূর্তিতে খোদাই করা রয়েছে ফারাও-এর নাম ও সীল। একটা মূর্তির জন্যে একজন কালেক্টর দশ লাখ ডলার দিতেও হয়তো আপত্তি করবেন না।'

রানার দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল নিমা। 'যাহ্! এত?'

'এতই। কিংবা আরও বেশি। এগুলো আমরা, যুদ্ধ ক্ষেত্রের এই মডেল পাঁচটা, লম্বা ক্রেটে ভরব। আমার ধারণা দুটো ক্রেটেই সবগুলোর জায়গা হয়ে যাবে।'

চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল নিমা, হঠাৎ রানার হাত ধরে ঝাঁকাল। 'রানা, স্টোরের সারি একটা নয়! দেখুন, প্রথম সারির পিছনে আরও এক সারি স্টোর রয়েছে!'

একজোড়া স্টোরের মাঝখানে সরু প্যাসেজ দেখা গেল, তার ভেতর দিয়ে পিছনের সারির স্টোরগুলোর সামনে চলে এল ওরা। তারপর দেখা গেল, দুই সারি নয়, আসলে তিন সারি স্টোর রয়েছে। প্রতিজোড়া স্টোরের মাঝখানের দেয়ালে চোখ জুড়ানো সব ছবি আঁকা, সবগুলোতেই রাজার জীবনকাহিনীর দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোন ছবিতে কন্যাদের সঙ্গে খেলছেন বা কৌতুক করছেন, কোন ছবিতে পুত্রসন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে মীটিং করছেন বা উপপত্নীদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ভোজনের দৃশ্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, পুরোহিতদের সঙ্গে বসে আছেন রাজা। প্রতিটি মানুষকে আঁকা হয়েছে চোখে দেখে, প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব থেকে নেয়া।

বিশাল কামরাটার সেন্ট্রাল প্যানেলগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা প্যানেলের দিকে হাত তুলে নিমা বলল, 'এটা নিশ্চয়ই টাইটার আত্মপ্রতিকৃতি।' ওটা একজন খোজা ব্যক্তির প্রতিকৃতি। 'নিজের চেহারা আঁকতে গিয়ে টাইটা কি পোয়েটিক লাইসেন্স নিয়েছে? নাকি সত্যিসত্যি এত সুদর্শন ছিল সে? ক্রীতদাসের চেহারায় এতটা আভিজাত্য থাকতে পারে?'

সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে টাইটার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া। সেই চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি। শিল্পীর হাত এত ভাল, ওরা যে তীব্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছে,

সে-ও ওদেরকে একই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীণ, স্মিত হাসি লেগে রয়েছে টাইটার মুখে। পেইন্টিংটা বার্নিশ করা, ফলে সুরক্ষিত রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে গতকাল আঁকা হয়েছে ছবিটা। টাইটার ঠোঁট একটু ভেজা ভেজা, চোখ দুটোয় চকচকে ভাব।

'গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, শ্বেতাঙ্গ বলা যাবে না,' মন্তব্য করল রানা। 'চোখও তো কালো। তবে লাল চুল রঙ করা হয়েছে হেনা দিয়ে।'

'কে জানে কোথায় টাইটার জন্ম। স্ক্রোলের কোথাও এ-সম্পর্কে কিছু বলেনি টাইটা। গ্রীস বা ইটালি হতে পারে না। জলদস্যু হতে পারে? আসলে টাইটার রুটস কোন দিনই জানা যাবে না, সে নিজেও সম্ভবত জানত না।'

'পাশের প্যানেলেও দেখা যাচ্ছে তাকে,' বলল রানা।

এই প্যানেলে রাজা ও রানীর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করছে টাইটা, রাজা ও রানী পাশাপাশি দুটো সিংহাসনে বসে আছেন। 'হিচককের মত,' বলল নিমা। 'নিজের সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত থাকতে ভালবাসত টাইটা।'

আরও এক সারি স্টোরের সামনে দিয়ে হেঁটে এল ওরা। এগুলোয় ঠাসা রয়েছে তৈজস-পত্র-বাসনকোসন, জার, গামলা, পানপাত্র, হাতা-চামচ। বেশিরভাগ সোনা বা রূপার তৈরি। পালিশ করা ব্রোঞ্জ আয়না দেখা গেল। মূল্যবান সিল্ক আর লিনেন-এর রোল রয়েছে, অনেক কাল আগেই পচে গিয়ে নরম ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে। তারপর, দু'সারি স্টোরের মাঝখানের দেয়ালে দেখা গেল হিকসস-এর সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্য, যে যুদ্ধে ফারাও আহত হয়েছিলেন। হিকসসের নিক্ষিপ্ত তীর রাজার বুকে বিঁধে রয়েছে। পরের দৃশ্যে টাইটা, সার্জেন, রাজার ওপর ঝুঁকে আছে, হাতে সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট, রাজার বুকের গভীর থেকে তীরটা বের করে আনছে।

এরপর ওরা সারি সারি কুলুঙ্গির সামনে এসে দাঁড়াল, ভেতরে কয়েক শো সিডার কাঠের বাক্স বা চেস্ট। বাক্সগুলোর গায়ে রাজার প্রতীক চিহ্ন আঁকা, আর ছবিগুলোয় দেখা যাচ্ছে রাজা টয়লেটে রয়েছেন, সুর্মা লাগাচ্ছেন চোখে, লাল রঙ দিয়ে রঙিন করছেন চেহারা, নাপিতরা তাঁর দাড়ি কামাচ্ছে, চাকরবাকরা পরাচ্ছে রাজকীয় পোশাক।

'কিছু বাক্সে রয়্যাল কসমেটিক্স আছে,' বলে উঠল নিমা। 'বাকিগুলোতে ফারাও-এর কাপড়চোপড়।'

পাশের দেয়ালের দৃশ্যগুলোয় দেখা যাচ্ছে রাজা বিয়ে করছেন। কুমারী লসট্রিস রানী হতে যাচ্ছেন। টাইটা ছিল রানী লসট্রিসের ক্রীতদাস। সে তার কর্ত্রীর অবয়ব আঁকার সময় সমস্ত মেধা ঢেলে দিয়েছে। রানীর চেহারার খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম সব বৈশিষ্ট্য এত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, নিষ্পলক তাকিয়ে শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে। কোন সন্দেহ নেই শিল্পী এখানে অতিরঞ্জনের স্বাধীনতা নিয়েছে। নগ্ন স্তন জোড়ার ওপর সযত্নে টানা ব্রাশ শুধু নিখুঁত আকৃতি দেয়ার কাজ করেনি, যৌন বিশুদ্ধতা ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেছে।

'টাইটা কতই না ভালবাসত রানীকে,' বলল নিমা, বলার সুরে ক্ষীণ ঈর্ষার ছোঁয়া থেকে গেল। 'প্রতিটি রেখায় তার প্রমাণ পাবেন আপনি।'

পরবর্তী সারির কুলুঙ্গিতে আরও কয়েকশো কাঠের বাক্স রয়েছে, ঢাকনির ওপর রাজার খুদে প্রতিকৃতি, সমস্ত অলঙ্কার পরে আছেন। তাঁর আঙুল আর গোড়ালিতে আঙটি ও ঘুঙুর, বুক সোনার মেডেলে মোড়া, বাহু আর কব্জিতে বালা পরানো। একটা প্রতিকৃতিতে দেখা গেল রাজা একত্রিত দুই মিশরীয় রাজ্যের জোড়া মুকুট পরে আছেন। একটা লাল, অপরটা সাদা–মুকুটের কপালে শকুন আর গোক্ষুরের মাথা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের মুকুট ব্যবহার করতেন তিনি। সব মিলিয়ে বারোটা মুকুট দেখল ওরা।

'ঢাকনিতে যা দেখছি, বাক্সের ভেতরও কি তাই আছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নিমা।

এমন কি রানাও চিন্তা করতে গিয়ে একটা ঢোক গিলল। নিমার প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, এই বিপুল ঐশ্বর্য কল্পনা করা সত্যি কঠিন। কোন বাক্স না খুলেই ইতিমধ্যে ওরা যা দেখেছে, তার মূল্য বুঝতে হলে কমপিউটার নিয়ে বসতে হবে। পরিমাণে এত বিপুল প্রত্ন সম্পদ এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি।

'আপনার মনে আছে, স্ক্রোলে কি লিখেছিল টাইটা? "এত বেশি গুপ্তধন কোন কালে কোথাও এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না"। দেখে মনে হচ্ছে কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি। ফারাও মামোসের ট্রেজার পুরোটাই আছে এখানে।'

পিছনের অর্থাৎ তৃতীয় সারির স্টোরগুলোয় রয়েছে চীনামাটি আর কাঠের মূর্তি। এমন কোন পেশা বা ব্যবসার লোক নেই যাদের মূর্তি এখানে পাওয়া যাবে না। পুরোহিত, লিপিকার, আইনবিশারদ, চিকিৎসক, কৃষক, মালী, রুটি আর মদ তৈরির কারিগর, নর্তকী, নাবিক, রজকিনী, সৈনিক, সাধারণ শ্রমিক, খোজা প্রহরী, রাজমিস্ত্রী, বাজনদার, মুসাফির, ভবঘুরে–সমাজের সর্ব স্তরের সবাই আছে, এমন কি বেশ্যাও। প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ পেশার যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম। এরা সবাই পরলোকে রাজার সঙ্গী হবে, সেবা করবে ফারাও-এর।

তোরণশোভিত বিশাল কামরার শেষ মাথায় এসে পৌছুল ওরা। সামনে এককালে ছিল কয়েক সারিতে টাঙানো সাদা লিনেন। ওগুলোর রঙ এখন আর সাদা নেই, পর্দাও আর পর্দা নেই। সব পচে গিয়ে রিবনের মত লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, দেখে মনে হচ্ছে নোংরা মাকড়সার জাল অথচ তারপরও পর্দায় লাগানো রত্নগুলো রিবনের সঙ্গে ঝুলছে, জেলের জালে ধরা পড়া চকচকে মাছের মত। জালের ভেতর আরও একটা দরজা দেখতে পেল ওরা।

'ওটা নিশ্চয়ই মূল সমাধিতে ঢোকার পথ,' ফিস ফিস করল নিমা। 'রাজা আর আমাদের মাঝখানে এখন শুধু পচা খানিকটা জাল ছাড়া আর কিছু নেই।'

কিন্তু দু'জনই ওরা পা বাড়াতে দ্বিধায় ভুগছে। সামনে কোন বিপদ নেই তো? টাইটার তৈরি সবগুলো ফাঁদ কি ওরা পেরিয়ে এসেছে?

পাঁচ

গেরিলাদের মধ্যে কোন ডাক্তার নেই, কমান্ডার শাফিই আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা করে, তার হাতের কাছে সব সময় একটা মেডিকেল কিটও থাকে। কোয়ারির কাছাকাছি একটা কুঁড়েতে রুবিকে বয়ে নিয়ে এল গেরিলারা, কুঁড়েটা ঘাসের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ছেঁড়া ট্রাউজার আর শার্ট খুলে রুবির ক্ষতগুলো ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে ধুলো শাফি, তারপর ফিল্ড ড্রেসিং দিয়ে প্রায় সবগুলো ঢেকে দিল। তারপর উপুড় করা হলো রুবিকে, অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে। ব্যথা পেয়ে উফ করে উঠল রুবি। শাফি নরম সুরে বলল, 'আমার হাত ডাক্তারদের মত ভাল নয়।'

'তবু আমার ভাগ্য যে তোমার হাতেই চিকিৎসা পাচ্ছি,' বলল রুবি। 'জানো, মৃত্যু ভয়ের চেয়ে বেশি ভুগেছি তোমাকে আর দেখতে পাব না ভেবে।'

নিজের প্যাক থেকে সোয়েটশার্ট আর ফেটিগ বের করে রুবিকে পরিয়ে দিল শাফি, কয়েক সাইজ বড় হয়েছে গায়ে। কালচে, ফোস্কা পড়া ঠোঁট নেড়ে রুবি বিড়বিড় করল, 'কুৎসিত লাগছে আমাকে, তাই না?'

সাবধানে তার গালে আঙুল বুলাল শাফি। 'আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তুমি, চিরকাল তাই থাকবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির আওয়াজ শুনল ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে এল, বয়ে নিয়ে এল উত্তরে বৃষ্টি ভেজা বাতাস। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শাফি। 'শুরু হয়েছে। কর্নেল ঘুমা হামলা করেছেন।'

'আমার দোষ। আমিই তাঁকে...'

'না,' দৃঢ় সুরে বলল শাফি। 'তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কথা না বললে ওরা তোমাকে মেরেই ফেলত। আর হামলা ওরা এমনিতেও করত।' ওয়েবিং বেল্ট তুলে কোমরে জড়াল সে। এবার দূর থেকে ভেসে এল মর্টার শেলের আওয়াজ। 'আমাকে এবার যেতে হবে, রুবি।'

'জানি। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

'তোমার চিন্তাই যুদ্ধ করতে উৎসাহ যোগাবে আমাকে। আমার লোকজন মঠে নামিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে। এক পর্যায়ে সবাই ওখানে জড়ো হব আমরা। যা-ই ঘটুক, ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি। কর্নেল ঘুমাকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তাঁর শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আমাদের।'

'তোমাকে ভালবাসি,' ফিসফিস করল রুবি। 'তোমার জন্যে চিরকাল অপেক্ষা করব।'

দরজার কাছে মাথা নিচু করে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেল শাফি।

*

পর্দার ফ্রেমে হাত ছোঁয়াতেই জালের মত রিবনগুলো টাইলের মেঝেতে খসে পড়ল। জালে আটকানো রত্নগুলো মেঝেতে পড়ে জলতরঙ্গের মত আওয়াজ তুলল। জালের গায়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে যথেষ্ট বড় একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। নিমার হাত ধরে পা বাড়াল রানা, থামল ইনার ডোরওয়ের সামনে। দরজা বা ফাঁকটার এক পাশে পাহারায় রয়েছে মহান দেবতা অসিরিস-এর বিশাল এক স্ট্যাচু, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী আইসিস, মাথায় লুনার ক্রাউন আর শিং। তাঁদের উদাস চোখের দৃষ্টি অনন্ত-অসীমের দিকে প্রসারিত, চেহারায় প্রশান্তির ভাব। বারো ফুট উঁচু জোড়া স্ট্যাচুর মাঝখান দিয়ে এগোল নিমা ও রানা, এবং অবশেষে ফারাও মামোসের আসল সমাধিতে পৌঁছে গেল।

ছাদটা গম্বুজ আকৃতির, গম্বুজ আর দেয়ালে আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে—ফরমাল ও ক্ল্যাসিকাল। রঙ এখানে আরও গাঢ়, প্যাটার্নগুলো জটিল। যতটা আশা করেছিল ওরা তারচেয়ে আকারে ছোট চেম্বারটা। স্বর্গীয় ফারাও মামোসের বিশাল গ্র্যানিট কফিনেরই শুধু জায়গা হয়েছে।

কফিনটা বুক সমান উঁচু। সাইড প্যানেলগুলো ভিত বা বেদীর সঙ্গে গাঁথা মনে হলো, ফারাও ও অন্যান্য দেবতাদের ছবি খোদাই করা। ঢাকনিতে একা শুধু রাজার চেহারা খোদাই করা হয়েছে, পুরো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে। দেখেই ওরা বুঝতে পারল, ঢাকনিটা এখনও আদি অবস্থানে রয়েছে, পুরোহিতের মাটির সীল পুরোপুরি অক্ষত। এই সমাধিতে কখনও কারও অনুপ্রবেশ ঘটেনি। ফারাও মামোসের মমি চার হাজার বছর ধরে নির্বিঘ্নে শুয়ে আছে এখানে।

তবে ওদেরকে বিস্মিত করল অন্য দুটো জিনিস। কফিনের ওপর পড়ে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর একটা ধনুক। লম্বায় প্রায় রানার সমান, স্টক-এর পুরোটা দৈর্ঘ্য ইলেকট্রাম কয়েল দিয়ে জড়ানো—সোনা ও রূপোর এই মিশ্রণ পদ্ধতি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

আরেকটা জিনিস, যা কখনই কোন রাজকীয় সমাধিতে থাকার কথা নয়, দাঁড়িয়ে আছে কফিনের গোড়ার কাছে। পুতুল আকৃতির মানুষের একটা মূর্তি। এক পলক তাকিয়েই জিনিসটার উন্নত মান ও পরিচয় বুঝতে পারল ওরা, খানিক আগে সমাধির বাইরে এই মূর্তির আঁকা মুখ দেখেছে ওরা তোরণশোভিত কামরাটায়।

টাইটার কথাগুলো, ক্রোলে ওরা পড়েছে, মনে হলো সমাধির ভেতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এই মুহূর্তে, জোনাকির মত জ্বল জ্বল করছে কফিনের ওপর—

"রাজকীয় কফিনের পাশে আমি যখন শেষবারের মত দাঁড়ালাম, শ্রমিকদের সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম বাইরে। আমি সবার শেষে সমাধি থেকে বেরুব, এবং আমি বেরুবার পর প্রবেশপথ সীল করে দেয়া হবে।

"একা হবার পর সঙ্গের বান্ডিলটা আমি খুললাম। ওটা থেকে লম্বা ধনুক, লানাটা, বের করলাম। আমার কর্ত্রীর নামানুসারে ওটার নাম রেখেছেন ট্যানাস, লানাটা ছিল আমার কর্ত্রীর ছোটবেলার নাম। আমি ট্যানাসের জন্যে

ধনুকটা তৈরি করি। ওটা ছিল আমাদের দু'জনের পক্ষ থেকে দেয়া শেষ উপহার। আমি ওটা তাঁর কফিনের সীল করা পাথুরে ঢাকনির ওপর রাখি।

"আমার বান্ডিলে আরও একটা জিনিস ছিল। আমার তৈরি ছোট একটা কাঠের মূর্তি। কফিনের গোড়ায় ওটা রাখি আমি। কাঠ খুদে ওটা যখন তৈরি করি, তিন দিকে তিনটে তামার আয়না রেখেছিলাম, যাতে করে প্রতিটি কোণ থেকে নিজের চেহারা দেখতে পাই, এবং হুবহু ফুটিয়ে তুলতে পারি নিজের বৈশিষ্ট্য। পুতুলটা আসলে খুদে টাইটা। পুতুলের গোড়ায় আমি লিখেছি..."

কফিনের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসল নিমা, ছোট্ট পুতুলটা হাতে নিল। গোড়ায় খোদাই করা হায়ারোগ্লিফিক্স দেখছে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে রানা বলল, 'পড়ুন তো দেখি।'

নরম সুরে শুরু করল নিমা, 'ঠিক আছে। "আমার নাম টাইটা। আমি একজন চিকিৎসক ও একজন কবি। আমি একজন আর্কিটেক্ট ও একজন দার্শনিক। আমি আপনার বন্ধু। আমি আপনার হয়ে জবাবদিহি করব"।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে সবই সত্যি,' ফিসফিস করল রানা।

ঠিক যেখান থেকে তুলেছে সেখানেই মূর্তিটা নামিয়ে রাখল নিমা। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আমি চাই এই মুহূর্ত যেন শেষ না হয়।'

ওদেরকে আসতে দেখছে শাফি। পাহাড়ের নিচের ঢালের কিনারা ঘেঁষে এগোচ্ছে দলটা। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে আসছে, বুশ-ফাইটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছাড়া দেখতে পাবার কথা নয়। প্রতিপক্ষ দলের শক্তি-সামর্থ্য উপলব্ধি করে হতাশ হলো শাফি। ওরা ক্র্যাক ট্রুপস, দীর্ঘ বহু বছর যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী মেনজিস্টুর বিরুদ্ধে লড়ার সময় এরাও তার দলে ছিল, ওদের অনেককেই সে ট্রেনিং দিয়েছে। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন ওরা তার সঙ্গে লড়তে আসছে। গোটা আফ্রিকা মহাদেশে এটাই হচ্ছে নিষ্ঠুর বাস্তবতা, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংগ্রামে পুষ্টি যোগায় প্রাচীন উপদলীয় কোন্দল, বর্তমান কালের রাজনীতিকদের লোভ আর দুর্নীতি।

তবে ক্ষোভ আর হতাশা প্রকাশ করার সময় এটা নয়। নিচের রণক্ষেত্রে কি কৌশল কাজে লাগবে সেটাই এখন তাকে খুঁজে বের করতে হবে। ওরা যারা আসছে তারা অবশ্যই দক্ষ সৈনিক। খুব অল্প লোককেই দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই গা ঢাকা দিয়ে আছে। 'কোম্পানী স্ট্রেংথ,' ভাবল সে, তারপর নিজের ছোট্ট ফোর্সের দিকে তাকাল। পাথরের ভাঁজে লুকিয়ে আছে চোদ্দজন গেরিলা। চমকে দেয়ার সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর যতটা সম্ভব জোরাল আঘাত হেনে পিছু হটতে হবে ওদেরকে, কর্নেল ঘুমার মর্টার শেল ওদের শুয়ে থাকা জায়গায় ছুটে আসার আগেই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে শাফি ভাবল কর্নেল ঘুমা বিমান হামলাও শুরু করবেন কিনা। আদ্দিসের এয়ার-বেস থেকে রুশ টুপোলেভ বম্বার এখানে আসতে সময় নেবে পঁয়ত্রিশ মিনিট। নাপামের গন্ধটা কল্পনা করল সে, মনের চোখ দিয়ে

দেখতে পেল আগুনের ঢেউ ওদের দিকে দ্রুত গড়িয়ে আসছে। তবে না, বিমান হামলার ঝুঁকি কর্নেল ঘুমা বা তাঁর পে-মাস্টার জার্মান হেস্ ভুগার্ড নেবেন না। গিরিখাদে রানা যা আবিষ্কার করেছে সে-সব দখল করাই ওঁদের উদ্দেশ্য, ধ্বংস করা নয়। লুঠের মাল আদ্দিসের কাউকে ভাগ দিতেও ওঁরা রাজি হবেন না। অ্যাবে গিরিখাদে এটা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিযান, সরকারকে জানাবার মত বোকামি তাঁরা করবেন না।

ঢালের গা বেয়ে আবার নিচে নেমে গেল শাফির দৃষ্টি। শত্রুপক্ষ পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে ডানডেরা নদীর দিকে এগোচ্ছে, উদ্দেশ্য নদীর পাশের ট্রেইলে অবস্থান গ্রহণ। খানিক পরই ওপরে, এদিকটায় একটা পেট্রল পাঠাবে ওরা, নিজেদের একটা পাশ সুরক্ষিত করার জন্যে, তারপরই সরাসরি ওপরে উঠবে। হ্যাঁ, ওই তো ওদেরকে দেখা যাচ্ছে। আট-না, দশজন লোক মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সরাসরি তার নিচে থেকে উঠে আসছে ওপর দিকে।

শাফি সিদ্ধান্ত নিল, ওদেরকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে দেবে সে। সব ক'টাকে সাবাড় করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সেটা বেশি আশা করা হয়ে যায়। চার-পাঁচজনকে ঘায়েল করতে পারলেই খুশি সে, বাকিগুলো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করুক। যুদ্ধে আহত লোকদের চিৎকার দারুণ উপকারী, সঙ্গী যোদ্ধারা মাথা নিচু করে রাখে, গুলি করার জন্যে মাথা তুলতে ভয় পায়।

পাথর ছড়ানো ঢালে চোখ বুলাল শাফি। আরপিডি লাইট মেশিন গান প্রতিপক্ষের অ্যাডভান্স গ্রুপের দিকে তাক করা রয়েছে। আলিম, তার মেশিন গানার, একজন ওস্তাদ। বলা যায় না, আলিম পাঁচ-সাতজনকেও ফেলে দিতে পারে। তারপর শাফি দেখল, তার ঠিক নিচেই রিজে একটা ফাঁক রয়েছে। খোলা রিজ পেরুবার ঝুঁকি ওরা নেবে না, ভাবল সে। ওপরে উঠবে ওই ফাঁক গলে, একজন একজন করে। তার আগে ফাঁকটার কাছাকাছি জড়ো হবে ওরা। তখনই সুযোগ পাবে তার গেরিলারা।

আবার আরপিডি-র দিকে তাকাল শাফি। আলিম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অপেক্ষা করছে সঙ্কেত পাবার। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেল শাফির দৃষ্টি। যা ভেবেছে, লাইনটা এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। বাম দিকের দীর্ঘদেহী লোকটা এরই মধ্যে পজিশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তার দু'পাশের দু'জন লোক তির্যক পথে এগোচ্ছে ফাঁকটার দিকে।

ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে কর্নেল ঘুমার সৈনিকদের ক্যামোফ্লেজ হুবহু মিলে গেছে, তাদের অস্ত্রও ক্যামোফ্লেজ নেটিঙে ঢাকা, রোদ যাতে প্রতিফলিত না হয়। ঝোপের ভেতর প্রায় অদৃশ্যই তারা, শুধু নড়াচড়া আর গায়ের রঙ ধরা পড়ছে চোখে। তারা এখন এত কাছে, মাঝে মধ্যে দু'একজনের চোখের মণি দেখতে পাচ্ছে শাফি। কিন্তু এখনও তাদের মেশিন গানারকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

প্রথম এক পশলা গুলিতেই প্রতিপক্ষের মেশিন গান স্তব্ধ করে দিতে হবে। আরে, ওই তো! ডান দিকের লাইনে দেখা যাচ্ছে গানারকে। লোকটা খাটো আর শক্ত-সমর্থ, কাঁধ দুটো ভারী, হাতগুলো লম্বা, লাইট মেশিন গানটাকে অনায়াসে বহন করছে নিতম্বের কাছে। অস্ত্রটা চিনতে পারল শাফি, রাশিয়ায় তৈরি ৭.৬২

আরপিডি। অ্যামুনিশন বেল্ট কাঁধ থেকে ঝুলছে, পিতলের কার্ট্রিজ চকচক করায় ধরা পড়ে গেল লোকটা।

নিচে নামছে শাফি, বেসের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার আড়াল দিচ্ছে তাকে। নিজের একেএম-এর রেট-অব-ফায়ার সিলেক্টর র‍্যাপিড-এ ঠেলে দিল সে, মুখের একটা পাশ ঠেকাল কাঠের স্টকে। জিনিসটা অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে কারিগরি ফলিয়ে নিখুঁত করা হয়েছে।

শাফি যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরপিডি বহনকারী প্রতিপক্ষ লোকটা আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে, উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল সে, আরও তিনজন লোক ফাঁকটা লক্ষ্য করে উঠছে—মাত্র এক পশলা গুলি করেই ওদের ব্যবস্থা করতে পারবে আলিম। এরপর আরপিডি মেশিন গানারের পেটে লক্ষ্যস্থির করল সে, ট্রিগার টানল তিনবার।

তিনটে বিস্ফোরণ তালা লাগিয়ে দিল কানে, তবে শাফি দেখতে পেল বুলেটগুলো টার্গেট মিস করেনি, পেট থেকে গলা পর্যন্ত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে। নিচেরটা লেগেছে নাভির কাছে, ওপরেরটা গলায়।

শাফির চারদিক থেকে গেরিলারা গুলি করছে। সে ভাবছে, কে জানে প্রথম দফায় ক'জনকে ফেলতে পারল আলিম। না, দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শত্রুপক্ষের সবাই ঝোপের নিচে। পাল্টা গুলিও হয়েছে, নীল ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ঝোপের মাথায়। কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল, তারপর শোনা গেল বিকট চিৎকার, 'আমাকে লেগেছে! যীশুর দোহাই, আমাকে বাঁচাও!' তার চিৎকার পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শাফি তার একেএম-এ নতুন ক্লিপ পরাল। 'গা, শালা, গান গা!' বিড়বিড় করল সে।

রানা আর নিমা তো হাত লাগালই, কফিন থেকে ঢাকনিটা তুলতে টোরা নাবুর আরও আটজন লোকের সাহায্য নিতে হলো। তোলার পর সবার হাত-পায়ের পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, খুব সাবধানে তারা সেটাকে সমাধির দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখল। এরপর কফিনের পাশে এসে ভেতরে তাকাল রানা ও নিমা।

পাথরের তৈরি কফিনের ভেতর আরও একটা কফিন রয়েছে, এটা কাঠের। এটার ঢাকনিতেও খোদাই করা হয়েছে ফারাও-এর আকৃতি। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর লাশের ছবি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। চেহারায় ফুটে আছে সুখময় প্রশান্তি।

দ্বিতীয় কফিনটা বের করল ওরা, পাথুরে ঢাকনির চেয়ে এটার ওজন কম। সাবধানে গোল্ডেন সীল আর শুকনো রেজিনের শক্ত স্তরে ফাটল ধরাল রানা, তা না হলে ঢাকনিটা আলগা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঢাকনি সরাবার পর দেখা গেল ভেতরে আরও একটা কফিন। সেটা খোলার পর আরও একটা। এভাবে সব মিলিয়ে সাতটা কফিন পাওয়া গেল, একটার চেয়ে অপরটা আকারে একটু ছোট, তবে অলঙ্করণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ল। সপ্তম কফিনটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য একজন মানুষের চেয়ে আকারে সামান্য বড়, এটা তৈরি করা হয়েছে সোনা দিয়ে। পালিশ করা

সোনায় ল্যাম্পের আলো পড়তে মনে হলো এক হাজার আয়না ঝলমল করে উঠল, সমাধির প্রতিটি কোণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আভায়।

অবশেষে সপ্তম কফিন খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ফুল রয়েছে। কুঁড়ি আর পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে রঙও। সুগন্ধও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু পচা একটা ঝাঁঝ। পাপড়িগুলোর এমন অবস্থা, ছুঁতে না ছুঁতেই গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। ফুলের নিচে রয়েছে মিহি লিনেন। এক সময় নিশ্চয়ই বকের পালকের মত সাদা ছিল, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে—পচা ফুলের রস ঝরে পড়ায়। নরম ভাঁজের ভেতর সোনার চকচকে ভাব দেখতে পেল ওরা।

কফিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রানা ও নিমা লিনেনের জাল ছাড়াল। ওদের আঙুলের চাপে টিস্যু পেপারের মত ছিঁড়ে গেল ওগুলো। দু'জনেই নিজের অজান্তে বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল ফারাও-এর ডেথ-মাস্ক উন্মোচিত হয়ে পড়ায়। মানুষের মাথার চেয়ে সামান্য একটু বড় ওটা আকারে, তবে সংশ্লিষ্ট মানুষটির হুবহু প্রতিচ্ছবি বলতে হবে মুখোশটিকে। শিল্পীর কাজ এত নিখুঁত, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো এতকাল পরও অটুট রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, স্ফটিকের চোখ দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ফারাও-ও, সেই চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি, মনে হলো যেন অভিযোগও আছে।

মমির মাথা থেকে মুখোশটা তুলতে সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সময় নিতে হলো ওদেরকে। তারপর যখন তুলল, আরও প্রমাণ পেল যে প্রাচীন কালে রাজা ও তাঁর জেনারেল ট্যানাস-এর দেহ অদলবদল করা হয়েছে। ওদের চোখের সামনে যে মমিটা পড়ে রয়েছে সেটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কফিনের তুলনায় বেশ বড়। আংশিক আচ্ছাদন মুক্ত অবস্থায় রাখা, অনেকটা গুঁজে ভরা হয়েছে।

'রাজকীয় মমির সঙ্গে কয়েকশো তাবিজ আর মন্ত্রঃপূত কবচ থাকবে, আবরণের নিচে,' ফিসফিস করে জানাল নিমা। 'এটা বিখ্যাত বা অভিজাত কোন ব্যক্তির মমি, কোনমতেই একজন রাজার হতে পারে না।'

লাশের মাথা থেকে ব্যান্ডেজের ভেতরের স্তর খুব সাবধানে খুলল রানা, ফলে মোটা দাড়ির কুণ্ডলী পাকানো জট বেরিয়ে পড়ল। 'তোরণের ভেতর কামরাটায় ফারাও মামোসের যে প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি, তাতে তাঁর দাড়ি ছিল হেনায় রাঙানো,' বিড়বিড় করল ও। 'এটা দেখুন।' এখানে মমির দাড়ি শুকনো ঘাসের মত, সোনালি আর রূপার মত। 'আর কোন সন্দেহ নেই,' আবার বলল ও। 'এটা ট্যানাস-এর মমি। ট্যানাস টাইটার বন্ধু ছিলেন, আর রানীর ছিলেন প্রেমিক।'

নিমার চোখে জল। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'লসট্রিসের পুত্রসন্তানের আসল বাবা তিনিই, পরে যিনি ফারাও টামোস হয়েছিলেন, হয়েছিলেন বহু রাজার পূর্ব-পুরুষ। কাজেই ইনিই সেই ব্যক্তি, যার রক্ত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জুড়ে বইছে।'

'সেই অর্থে যে-কোন ফারাও-এর মতই মহান ছিলেন তিনি,' শান্ত সুরে বলল রানা।

কথাটা প্রথমে খেয়াল হলো নিমার। 'নদী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, গলায় ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। 'নদী ফুলে উঠলে সব আবার হারিয়ে যাবে!'

আরপিডি। অ্যামুনিশন বেল্ট কাঁধ থেকে ঝুলছে, পিতলের কার্ট্রিজ চকচক করায় ধরা পড়ে গেল লোকটা।

নিচে নামছে শাফি, বেসের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বোল্ডার আড়াল দিচ্ছে তাকে। নিজের একেএম-এর রেট-অব-ফায়ার সিলেক্টর র‍্যাপিড-এ ঠেলে দিল সে, মুখের একটা পাশ ঠেকাল কাঠের স্টকে। জিনিসটা অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে কারিগরি ফলিয়ে নিখুঁত করা হয়েছে।

শাফি যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে আরপিডি বহনকারী প্রতিপক্ষ লোকটা আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে, উঠে আসছে ঢাল বেয়ে। ডান দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল সে, আরও তিনজন লোক ফাঁকটা লক্ষ্য করে উঠছে–মাত্র এক পশলা গুলি করেই ওদের ব্যবস্থা করতে পারবে আলিম। এরপর আরপিডি মেশিন গানারের পেটে লক্ষ্যস্থির করল সে, ট্রিগার টানল তিনবার।

তিনটে বিস্ফোরণ তালা লাগিয়ে দিল কানে, তবে শাফি দেখতে পেল বুলেটগুলো টার্গেট মিস করেনি, পেট থেকে গলা পর্যন্ত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে। নিচেরটা লেগেছে নাভির কাছে, ওপরেরটা গলায়।

শাফির চারদিক থেকে গেরিলারা গুলি করছে। সে ভাবছে, কে জানে প্রথম দফায় ক'জনকে ফেলতে পারল আলিম। না, দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শত্রুপক্ষের সবাই ঝোপের নিচে। পাল্টা গুলিও হয়েছে, নীল ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ঝোপের মাথায়। কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল, তারপর শোনা গেল বিকট চিৎকার, 'আমাকে লেগেছে! যীশুর দোহাই, আমাকে বাঁচাও!' তার চিৎকার পাহাড়ে লেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শাফি তার একেএম-এ নতুন ক্লিপ পরাল। 'গা, শালা, গান গা!' বিড়বিড় করল সে।

রানা আর নিমা তো হাত লাগালই, কফিন থেকে ঢাকনিটা তুলতে টোরা নাবুর আরও আটজন লোকের সাহায্য নিতে হলো। তোলার পর সবার হাত-পায়ের পেশী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, খুব সাবধানে তারা সেটাকে সমাধির দেয়াল ঘেঁষে নামিয়ে রাখল। এরপর কফিনের পাশে এসে ভেতরে তাকাল রানা ও নিমা।

পাথরের তৈরি কফিনের ভেতর আরও একটা কফিন রয়েছে, এটা কাঠের। এটার ঢাকনিতেও খোদাই করা হয়েছে ফারাও-এর আকৃতি। এখানে দেখানো হয়েছে তাঁর লাশের ছবি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, এক হাতে বাঁকা লাঠি। চেহারায় ফুটে আছে সুখময় প্রশান্তি।

দ্বিতীয় কফিনটা বের করল ওরা, পাথুরে ঢাকনির চেয়ে এটার ওজন কম। সাবধানে গোল্ডেন সীল আর শুকনো রেজিনের শক্ত স্তরে ফাটল ধরাল রানা, তা না হলে ঢাকনিটা আলগা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ঢাকনি সরাবার পর দেখা গেল ভেতরে আরও একটা কফিন। সেটা খোলার পর আরও একটা। এভাবে সব মিলিয়ে সাতটা কফিন পাওয়া গেল, একটার চেয়ে অপরটা আকারে একটু ছোট, তবে অলঙ্করণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ল। সপ্তম কফিনটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য একজন মানুষের চেয়ে আকারে সামান্য বড়, এটা তৈরি করা হয়েছে সোনা দিয়ে। পালিশ করা

সোনায় ল্যাম্পের আলো পড়তে মনে হলো এক হাজার আয়না ঝলমল করে উঠল, সমাধির প্রতিটি কোণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি আভায়।

অবশেষে সপ্তম কফিন খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ফুল রয়েছে। কুঁড়ি আর পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে রঙও। সুগন্ধও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু পচা একটা ঝাঁঝ। পাপড়িগুলোর এমন অবস্থা, ছুঁতে না ছুঁতেই গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। ফুলের নিচে রয়েছে মিহি লিনেন। এক সময় নিশ্চয়ই বকের পালকের মত সাদা ছিল, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে–পচা ফুলের রস ঝরে পড়ায়। নরম ভাঁজের ভেতর সোনার চকচকে ভাব দেখতে পেল ওরা।

কফিনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রানা ও নিমা লিনেনের জাল ছাড়াল। ওদের আঙুলের চাপে টিস্যু পেপারের মত ছিঁড়ে গেল ওগুলো। দু'জনেই নিজের অজান্তে বিস্ময়সূচক আওয়াজ করল ফারাও-এর ডেথ-মাস্ক উন্মোচিত হয়ে পড়ায়। মানুষের মাথার চেয়ে সামান্য একটু বড় ওটা আকারে, তবে সংশ্লিষ্ট মানুষটির হুবহু প্রতিচ্ছবি বলতে হবে মুখোশটিকে। শিল্পীর কাজ এত নিখুঁত, চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো এতকাল পরও অটুট রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, স্ফটিকের চোখ দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন ফারাও-ও, সেই চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি, মনে হলো যেন অভিযোগও আছে।

মমির মাথা থেকে মুখোশটা তুলতে সাহস সঞ্চয়ের জন্যে সময় নিতে হলো ওদেরকে। তারপর যখন তুলল, আরও প্রমাণ পেল যে প্রাচীন কালে রাজা ও তাঁর জেনারেল ট্যানাস-এর দেহ অদলবদল করা হয়েছে। ওদের চোখের সামনে যে মমিটা পড়ে রয়েছে সেটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কফিনের তুলনায় বেশ বড়। আংশিক আচ্ছাদন মুক্ত অবস্থায় রাখা, অনেকটা গুঁজে ভরা হয়েছে।

'রাজকীয় মমির সঙ্গে কয়েকশো তাবিজ আর মন্ত্রঃপূত কবচ থাকবে, আবরণের নিচে,' ফিসফিস করে জানাল নিমা। 'এটা বিখ্যাত বা অভিজাত কোন ব্যক্তির মমি, কোনমতেই একজন রাজার হতে পারে না।'

লাশের মাথা থেকে ব্যান্ডেজের ভেতরের স্তর খুব সাবধানে খুলল রানা, ফলে মোটা দাড়ির কুণ্ডলী পাকানো জট বেরিয়ে পড়ল। 'তোরণের ভেতর কামরাটায় ফারাও মামোসের যে প্রতিকৃতি আমরা দেখেছি, তাতে তাঁর দাড়ি ছিল হেনায় রাঙানো,' বিড়বিড় করল ও। 'এটা দেখুন।' এখানে মমির দাড়ি শুকনো ঘাসের মত, সোনালি আর রুপার মত। 'আর কোন সন্দেহ নেই,' আবার বলল ও। 'এটা ট্যানাস-এর মমি। ট্যানাস টাইটার বন্ধু ছিলেন, আর রানীর ছিলেন প্রেমিক।'

নিমার চোখে জল। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'লসট্রিসের পুত্রসন্তানের আসল বাবা তিনিই, পরে যিনি ফারাও টামোস হয়েছিলেন; হয়েছিলেন বহু রাজার পূর্ব-পুরুষ। কাজেই ইনিই সেই ব্যক্তি, যার রক্ত প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জুড়ে বইছে।'

'সেই অর্থে যে-কোন ফারাও-এর মতই মহান ছিলেন তিনি,' শান্ত সুরে বলল রানা।

কথাটা প্রথমে খেয়াল হলো নিমার। 'নদী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, গলায় ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ধার। 'নদী ফুলে উঠলে সব আবার হারিয়ে যাবে!'

'তবে সবই যে আমরা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারব, তা ভাববেন না। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না এক জায়গায় এত সম্পদ থাকতে পারে। এদিকে আমাদের সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, নিমা।'

'তাহলে?' চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে নিমা।

'সবচেয়ে সুন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো ক্রেটে ভরব আমরা,' বলল রানা। 'আল্লাই জানে সে-সময়ও পাব কিনা।'

কাজেই চরম ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ শুরু করল ওরা। পাঁচটা রণক্ষেত্রের সমস্ত স্বর্ণমূর্তি প্রথমে বাক্স বন্দী করা হলো। পাঁচটা লম্বা বাক্স লাগল ওগুলোর জন্যে। 'বাংলাদেশী টাকায় কত হবে এই বাক্সগুলোর দাম?' কাজ থেকে হাত না সরিয়েই রানাকে প্রশ্ন করল নিমা। 'আমি আন্দাজ করতে বলছি।'

'কম করেও হাজার কোটি,' বলল রানা। 'আসলে আন্দাজ করাটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর প্রত্নমূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

স্ট্যাচু, দেয়ালচিত্র, ফার্নিচার আর অস্ত্রগুলো নেয়ার কথা ভাবতেই পারা গেল না। পড়ে থাকবে তৈজস-পত্র, কাপড়-চোপড় আর কসমেটিক্সও। সোনার তৈরি বিশাল একটা রথও চার হাজার বছর ধরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই রেখে যাবে ওরা।

ট্যানাসের মাথা থেকে সোনার ডেথ-মাস্ক তুলে নিল ওরা, তবে মমিটা কফিনের ভেতর থেকে গেল। তারপর নতুন প্রধান পুরোহিত ময়সি মাতুবাকে খবর পাঠাল রানা। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল প্রাচীন সেইন্টের মরদেহ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে, সেটা গ্রহণ করার জন্যে বিশজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে চলে এলেন তিনি। ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ট্যানাস-এর কফিন বয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা, মঠের মাকডাস-এ স্থাপন করা হবে।

ইতিমধ্যে পাঁচটা রণক্ষেত্রের সমস্ত মূর্তি বাক্সে ভরার কাজ শেষ হয়েছে। তবে এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে ডেথ-মাস্ক। একটা ক্রেটের ভেতর অনায়াসে ভরা গেল ওটাকে, পাশে শোয়ানো হলো টাইটার খুদে মূর্তিটাকে। ক্রেটে ফোম ভরা হয়েছে, ঢাকনির ওপর ওয়াটারপ্রুফ ওয়াক্স ক্রেয়ন দিয়ে লেখা হলো—মাস্ক ও টাইটার কাঠের মূর্তি।

বেশিরভাগ গুপ্তধনই ফেলে যেতে হবে, কারণ হাতে সময় নেই। গায়ে ছবি আঁকা কাঠের চেস্টগুলো আর্টিফ্যাক্টস হিসেবে অমূল্য, ভেতরের জিনিস-পত্র বাদেই। কিন্তু অসংখ্য চেস্টের মধ্যে থেকে কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা নেবে ওরা? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, চেস্টের ঢাকনি ও গায়ে আঁকা ছবি দেখে বাছাই করা হবে। তার আগে কয়েকটা ঢাকনি খুলে দেখে নিতে হলো ছবির সঙ্গে ভেতরের জিনিস-পত্র মেলে কিনা। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফারাও তাঁর ব্লু ওঅর ক্রাউন পরে আছেন, সেই মুকুট ভেতরেও পাওয়া গেল। শুধু যে ব্লু ক্রাউন তাই নয়, লাল আর সাদা মুকুট জোড়াও অন্য একটা চেস্টে পেল ওরা। সবগুলোই অক্ষত ও অটুট অবস্থায় রয়েছে।

এরপর শুধু ছোটখাট আর্টিফ্যাক্ট ভরা হলো অ্যামুনিশন ক্রেটে। আকারে

যেগুলো বড়, যতই ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক, বাদ দিতে হলো। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, রাজকীয় অলঙ্কার আর মূল্যবান পাথর ভরা চেস্টগুলো ক্রেটের ভেতর জায়গা করে নিতে পারছে, ফলে শুধু পাথর আর অলঙ্কারই নয়, চেস্টগুলোও অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি করা যাবে। তারপর বড় আইটেমগুলো, তিনটে মুকুট আর রত্নখচিত কয়েকটা বক্ষাবরণ সহ, সদ্য তৈরি বড় কয়েকটা বাক্সে ভরা হলো।

প্রতিটি অ্যামুনিশন ক্রেট ভরা হয়ে গেছে, তারপরও মাত্র পাঁচ শতাংশ প্রত্ন-সম্পদ নিতে পারছে ওরা। ক্রেটগুলো বয়ে আনা হলো সীল করা ডোরওয়ের বাইরে। লম্বা গ্যালারির আটটা স্ট্যাচুও নিচ্ছে ওরা। ওগুলো বাক্সে ভরার কাজ শেষ হয়েছে, এই সময় সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে আসতে দেখা গেল মারটিনকে। 'তুমি কি মরতে চাও, রানা? আর এক মিনিট সময়ও পাচ্ছ না। নদী ফুঁসছে, ফর গড'স সেক! বাঁধটা যে-কোন মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে।'

তোরণের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মারটিন, স্তম্ভিত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল। তবে বিস্ময়ের ঘোরটা কয়েক মুহূর্ত পরই সামলে নিল সে। 'মিনিট, রানা, ঘণ্টা নয়! যীশুর কিরে, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তাছাড়া, গিরিখাদের মাথায় যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে কমান্ডার শাফি। টাইটার পুল থেকে তুমি গুলির আওয়াজও শুনতে পাবে। মিস নিমাকে নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে তোমার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ওদিকের সিঁড়ির নিচে, চেম্বারে, ক্রেটগুলো দেখেছ তো?' মাথা ঝাঁকাল মারটিন। 'গুড। ওগুলো মঠে নামিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। তুমিই কাজটা সুপারভাইজ করবে, ঠিক আছে? বাকি সবাইকে নিয়ে ট্রেইলে তোমাকে আমরা অনুসরণ করব।

'রানা, দোহাই লাগে, সময় নষ্ট করো না। বিপদ এলে বলতে পারবে না আমি তোমাকে সাবধান করিনি।'

'তুমি যাও, আমরা আসছি,' বলল রানা। 'বোটগুলো কোথায় আছে, জানো তো? মঠে পৌছেই ওগুলোয় বাতাস ভরার ব্যবস্থা করবে।'

মারটিন চলে যেতেই ছুটে তোরণের ভেতর ঢুকল রানা, নিমা যেখানে এখনও ট্রেজার ভরছে ক্রেটে। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার চলুন!'

'কিন্তু রানা, এ-সব আমরা ফেলে যেতে পারি না…'

'বেরোন, এখুনি বেরোন!' কঠিন সুরে ধমক দিল রানা। 'বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে! কি বলছি, শুনতে পাচ্ছেন, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে!'

'আমি কি শুধু…'

'না, আর কিছুই নিতে পারবেন না। উঠুন!' ঝুঁকে নিমার বাহু ধরে টান দিল রানা।

ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নিমা, ওর হাতে চেস্ট থেকে তোলা এক গাদা সোনার অলঙ্কার। 'এগুলো ফেলে যাই কি করে!' ওগুলো ট্রাউজারের পকেটে ভরতে শুরু করল।

ঝুঁকল রানা, দু'হাতে ধরে নিমাকে তুলে নিল বুকে, তারপর তোরণ পেরিয়ে এসে ছুটল।

চেম্বারের দূর প্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে টোরা নাবুর কয়েকজন লোক,

প্রত্যেকের মাথায় একটা করে ক্রেট। এখানে পৌঁছে নিমাকে নামাল রানা, বলল, 'কোন রকম পাগলামি করবেন না!'

মাথা নাড়ল নিমা, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। সিঁড়ি বেয়ে রানার আগে ছুটল সে। মাথায় বোঝা থাকলেও, পোর্টাররা শৃঙ্খলা বজায় রেখে দ্রুতই এগোচ্ছে। তাদের দীর্ঘ এক লাইনের মিছিলের সঙ্গে মিশে গেল রানা ও নিমা, আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। প্রতিটি বাঁকে চক দিয়ে আঁকা চিহ্ন থাকায় পথ চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। অবশেষে বিধ্বস্ত লম্বা গ্যালারিতে পৌঁছুল ওরা। সীল করা ডোরওয়েটা ভেঙে গেছে, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মারটিন। ওদেরকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'তোমাকে না মঠে গিয়ে বোটগুলো রেডি করতে বললাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার একটা দায়িত্ব বোধ আছে,' গম্ভীর সুরে বলল মারটিন। 'তোমাদের না নিয়ে যাই কিভাবে?'

কথা না বলে তার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল রানা, তারপর ছুটে অ্যাপ্রোচ টানেল পেরুল, উঠে এল সিঙ্ক-হোল-এর ওপর ভাসমান সেতুতে। ঘাড় ফিরিয়ে মারটিনের দিকে তাকাল ও, হাঁপাচ্ছে; চিৎকার করে জানতে চাইল, 'শাফি কোথায়? রুবিকে তুমি দেখছ?'

'রুবি ফিরে এসেছেন, তবে তাঁর অবস্থা খুবই করুণ।'

'কেন, কি হয়েছে তার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথায় সে?'

'হেস ডুগার্ডের গরিলাটা ধরেছিল তাকে, মারধর করেছে। শাফির লোকজন মঠে নিয়ে গেছে তাঁকে। কথা হয়েছে বোটের কাছে অপেক্ষা করবে।'

'গুড। আর শাফি?'

'কর্নেল ঘুমার আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করছে। সেই সকাল থেকে রাইফেল, গ্রেনেড আর মর্টারের আওয়াজ পাচ্ছি। শাফিও পিছু হটে মঠে পৌঁছুবে, বোটের কাছে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

টানেলের শেষ কয়েক গজ পানির ওপর দিয়ে ছুটল ওরা। বাইরে বেরিয়ে এসে ক্রল করে টাইটার পুলকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলে উঠে পড়ল। ওখান থেকে চলে এল পাহাড়ের গোড়ায় সরু কার্নিসে। মুখ তুলে রানা দেখল টোরা নাবুর লোকজন দোলনার মত দেখতে চওড়া কপিকলে তুলে পাহাড় প্রাচীরের চূড়ায় ক্রেটগুলো ওঠাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শব্দ ঢুকল কানে, সঙ্গে সঙ্গে চিনতেও পারল। 'গান ফায়ার!' নিমাকে বলল ও। 'শাফি লড়ছে এখনও, তবে পিছু হটে খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।'

ঝুলন্ত মাচায় উঠে পড়ল ওরা। পাহাড় প্রাচীরের চূড়ায় পৌঁছে চারদিকে তাকাল। মাথার ওপর সূর্য, তেতে আগুন হয়ে আছে। সব ক'টা ক্রেট নিয়ে পোর্টাররা ওপরে উঠেছে কিনা চেক করল রানা। ঝোপ-ঝাড় ঢাকা ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে গেল তারা, কলামের মাথায় থাকল মারটিন, গোড়ায় রানা ও নিমা। যুদ্ধের আওয়াজ এত কাছে চলে এসেছে, ভয়ে কাঁপ ধরে যাচ্ছে বুকে। মনে হলো গিরিখাদের ভেতর মাত্র আধ মাইল দূরে লড়াই করছে ওরা। অটোমেটিক

রাইফেলের আওয়াজ পোর্টারদের ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল, ঝোপ-ঝাড়ের জঙ্গল পার হয়ে মেইন ট্রেইলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে চাইছে ওরা, কর্নেল ঘুমার সৈনিকরা পথটা দখল করে নেয়ার আগেই।

পথের জাংশনে পৌঁছুবার আগেই স্ট্রেচার সহ একদল গেরিলাকে দেখতে পেল ওরা। তারাও মঠের দিকে যাচ্ছে। কাছাকাছি এসে রানা দেখল স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছে রুবি। তার মুখে ব্যান্ডেজ আর করুণ চেহারা দেখে মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা। 'রুবি! কে আপনার এই অবস্থা করল?'

অভিমানী শিশুর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল রুবি। থেমে থেমে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে দু'একটা মাত্র শব্দ বলতে পারল।

'রাফেল!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। 'বেজন্মাটাকে ধরতে পারলে হয়!' ওর পাশে এসে দাঁড়াল নিমা, রুবিকে দেখে বিকৃত হয়ে উঠল ওর চেহারা।

রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিল নিমা, বলল, 'আপনি অন্য দিকে যান, আমি ওর পাশে থাকি।'

রানা এক পাশে সরে এসে স্ট্রেচার বহনকারীদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'সাবুর, কি ঘটছে ওদিকে?'

'গিরিখাদের পুব দিক থেকে একটা ফোর্স নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন কর্নেল ঘুমা,' বলল সাবুর। 'পাশ দিয়ে এগিয়ে এসেছে ওরা, তাই আমরা পিছু হটছি। এই যুদ্ধে আমরা অভ্যস্ত নই।'

'জানি,' মন্তব্য করল রানা। 'গেরিলারা সব সময় জায়গা বদল করবে। শাফি কোথায়?'

'গহ্বরের পুব পাড় ধরে পিছু হটছেন তিনি,' সাবুর যখন উত্তর দিচ্ছে, ওদের পিছন থেকে গোলাগুলির নতুন আরেক দফা আওয়াজ ভেসে এল। 'ওই ওখানে উনি!' মাথা ঝাঁকাল সাবুর। 'কর্নেল ঘুমা তাঁকে তাড়া করছেন।'

ছয়

অ্যাবে গিরিখাদের মাথায় জমাট বাঁধছে ঘন কালো মেঘ। প্রক্সি কোম্পানীর জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে উড়ছে। রাফেল জানে অ্যালান শাফির কাছে আরপিডি, রকেট-লঞ্চার আছে, গিরিখাদের ভেতর পাহাড়-শ্রেণীর আড়াল না নিয়ে উপায় নেই তাদের। ডান দিকের সীটে বসেছে সে, পাইলটের পাশে। পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছেন হেস ডুগার্ড আর কারিফ ফারুকী, দু'জনেই পিছন দিকে ছুটন্ত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কয়েক মিনিট পরপর জ্যান্ত হয়ে উঠছে রেডিও, গ্রাউন্ডে কর্নেল ঘুমার লোকজন মর্টার সাপোর্ট চাইছে কিংবা লক্ষ্য অর্জনের রিপোর্ট দিচ্ছে।

'ওরা কি গহ্বরের সেই জায়গায় পৌঁছেছে,' জানতে চাইলেন ডুগার্ড, মাসুদ রানা যেখানে কাজ করছে?'

উত্তর পেতে আরও খানিকটা সময় লাগল। রেডিও থেকে সরাসরি কর্নেল ঘুমার আওয়াজ ভেসে এল। 'আমরা সফল হয়েছি, হের ডুগার্ড। সমস্ত পজিশন দখল করে নিয়েছি। কপিকলে চড়ছে আমার লোকজন, গহ্বরের নিচে নামতে যাচ্ছে ওরা।'

ডুগার্ড পাইলটকে প্রশ্ন করলেন, 'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট পাঁচেক, স্যার।'

'পৌঁছুবার পর জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর মারবেন, সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড করবেন না।'

ট্রেইলের জাংশনে অপেক্ষা করছিল মারটিন। নদী এখানে নতুন পথ ধরে সগর্জনে উপত্যকা বেয়ে নেমে যাচ্ছে, নামার পথে আদি ট্রেইলের কিছুটা অংশ ডুবিয়ে দিয়েছে। মাথায় ক্রেট নিয়ে পোর্টাররা উঠে যাচ্ছে উঁচু জমিনে। 'নাবু কোথায়?' মারটিনকে জিজ্ঞেস করল রানা। পোর্টারদের দীর্ঘ লাইনে তরুণ টোরা নাবুকে দেখেনি ও।

'আমি তো জানতাম সে তোমার সঙ্গে আছে,' জবাব দিল মারটিন।

ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল রানা, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা ট্রেইলে আর কেউ নেই। 'কে এখন খুঁজতে যায়! মঠে তাকে একাই ফিরতে হবে।' ও থামতেই দূর থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। প্রক্সির 'কপ্টার, ভাবল রানা। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে সরাসরি টাইটার পুলের দিকে যাচ্ছেন ডুগার্ড। তারমানে ওরা কোথায় কাজ করছিল, জার্মান ধনকুবের আগে থেকেই তা জানে।

আওয়াজটার দিকে মুখ তুলে রয়েছে নিমাও, আশা ঘন কালো মেঘের গায়ে কোথাও হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পাবে। 'শুয়োরের দলটা আমাদের সমাধিতে ঢুকলে পবিত্র একটা জায়গার মর্যাদা নষ্ট হবে,' বলল ও, গলায় রাগ।

হঠাৎ এগিয়ে এসে স্ট্রেচারের পাশে দাঁড়ানো নিমার একটা হাত চেপে ধরল রানা। 'ঠিক বলেছেন আপনি! রুবিকে নিয়ে মঠে চলে যান আপনি। আমি একটু পরে আসছি।' নিমা প্রতিবাদ করার আগেই ছুটে মারটিনের সামনে চলে এল ও। 'মারটিন, মেয়ে দুটোর দায়িত্ব তোমার ওপর থাকল।'

রানার পিছনে চলে এল নিমা। 'কি করতে চাইছেন, বলবেন আমাকে?'

'ছোট্ট একটা কাজ আছে। খুব বেশি দেরি করব না।'

'নিশ্চয়ই আপনি ওখানে আবার ফিরে যেতে চাইছেন না?' আতঙ্কিত দেখাল নিমাকে। 'ধরতে পারলে ওরা আপনাকে স্রেফ খুন করবে...'

'চিন্তা করবেন না,' বলে হেসে উঠল রানা, তারপর নিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর ঠোঁটে হালকা একটা চুমো খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ফিরতি পথে ছুটছে। 'রুবির দিকে খেয়াল রাখবেন।'

বাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে এল জেট রেঞ্জার। বাঁধ পিছিয়ে পড়তে গিরিখাদের আরও গভীরে নামল 'কপ্টার। দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর, মাঝখানে সরু ফাঁক, তার ভেতর দিয়ে ছুটছে ওরা। গহ্বরটা প্রায় শুকনো এখন, জমে থাকা পানি

স্থির। 'ওই তো! ওই তো ওরা!' সরাসরি সামনে হাত তুলল রাফেল। ওদিকে একদল লোককে দেখা যাচ্ছে, গহ্বরের কিনারায়। 'কর্নেল ঘুমাকে আমি চিনতে পারছি! তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের স্পাই, টোরা নাবু।' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, পাইলটকে বলল, 'তুমি ল্যান্ড করতে পারো। ওই দেখো, কর্নেল ঘুমা হাত নাড়ছেন।'

হেলিকপ্টারের স্কিড জমিন স্পর্শ করতেই নাবুকে নিয়ে ছুটে এলেন কর্নেল ঘুমা। ডুগার্ডকে নিচে নামতে সাহায্য করল ওরা, ঘুরন্ত রোটরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। 'আমার লোকেরা জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। ডাকাতদের ধাওয়া করেছিলাম, উপত্যকার দিকে সরে যেতে বাধ্য করেছি।' তারপর টোরা নাবুর পরিচয় দিলেন ঘুমা। 'নাবু মাসুদ রানার সঙ্গে সমাধির ভেতর ছিল, টানেলের প্রতিটি ইঞ্চি চেনে।'

'ইংরেজি বোঝে?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

'এক-আধটু।'

'গুড! গুড!' নাবুর দিকে তাকালেন ডুগার্ড। 'ওহে, সন্ন্যাসী, পথ দেখাও আমাকে। আসুন, ফারুকী, আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। প্রচুর বেতন দেয়া হয়েছে আপনাকে, এবার কিছু কাজ দেখান।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারায়, কপিকলের কাছে নিয়ে এল নাবু। কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে গহ্বরের নিচে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন ডুগার্ড। কপিকলের বাঁশের কাঠামো ভঙ্গুর আর নড়বড়ে মনে হলো। পিছন থেকে নাবু বলল, 'স্যার, সমাধিতে নামার এটাই একমাত্র পথ।'

চোখ বুজে রশির দোলনায় বসলেন ডুগার্ড। একে একে নিচে নামল ওরা। 'টানেলটা কোথায়?' চারদিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

হাত তুলে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার ফাঁকটা দেখাল নাবু। টাইটার পুলকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে সরু কার্নিসে চলে এল সবাই। রাফেল আর কর্নেলের দিকে তাকালেন ডুগার্ড। 'রাফেলকে নিয়ে আপনি এখানে পাহারায় থাকুন, কর্নেল,' বললেন তিনি। 'নাবু আর ফারুকীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছি আমি।' রাফেলের দিকে তাকালেন। 'দরকার হলে তোমাদেরকে আমি ডেকে পাঠাব।'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে খুশি হতাম,' বলল রাফেল। 'আপনার নিরাপত্তার দিকটা...'

ভুরু কুঁচকে ডুগার্ড বললেন, 'যা বলছি শোনো।' টানেলের মুখে ঢুকে পড়লেন তিনি। ফারুকী আর নাবু তাঁকে অনুসরণ করল। 'এত আলো আসছে কোত্থেকে?' জানতে চাইলেন ডুগার্ড।

নাবু বলল, 'একটা মেশিন আছে।' তারপর ওরা শুনতে পেল সামনে থেকে জেনারেটরের অস্পষ্ট যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। সিঙ্ক-হোলের ওপর ভাসমান সেতুতে না পৌঁছুনো পর্যন্ত ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না।

'এখানে পানি কেন?' বিড়বিড় করলেন ফারুকী। 'মিশরীয় অন্য কোন প্রাচীন সমাধিতে পৌঁছুতে হলে এরকম পানি পেরুতে হয়েছে বলে তো শুনিনি।'

'আপনি বেশি কথা বলেন,' ধমক দিলেন ডুগার্ড। 'আগে দেখতে দিন এই

লোক আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়।'

সেতু পেরুবার সময় নাবুর কাঁধে ভর দিয়ে থাকলেন তিনি। এখান থেকে টানেল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। হাই-ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে এল ওরা। টানেলের দেয়াল এদিকে পালিশ করা পাথর, লক্ষ করে ফারুকী মন্তব্য করলেন, 'নাহ, আমারই ভুল হয়েছিল। টানেলের এদিকে তো দেখছি মিশরীয় প্রভাব স্পষ্ট!'

বিধ্বস্ত গ্যালারির বাইরে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। এখানে জেনারেটর রয়েছে। ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে গেছেন ডুগার্ড ও ফারুকী, দু'জনেই ঘামছেন–যতটা না ক্লান্তিতে, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়।

'যত দেখছি ততই আশা জাগছে বুকে,' বললেন ফারুকী। 'এটা কোন রাজকীয় সমাধি হওয়া বিচিত্র নয়।'

এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ করা রয়েছে প্লাস্টার সীল, হাত তুলে সেগুলো ফারুকীকে দেখালেন ডুগার্ড। ওগুলোর সামনে হাঁটু গাড়লেন ফারুকী, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। 'ফারাও মামোসের সীল,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল তাঁর গলা। 'সঙ্গে লিপিকার টাইটার সই!' চকচকে চোখ তুলে ডুগার্ডের দিকে তাকালেন। 'এখন আর কোন সন্দেহই নেই। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম সমাধিতে নিয়ে আসব, এনেছিও।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বললেন না ডুগার্ড। তারপরই যেন বিস্ফোরিত হলেন। 'কিন্তু কি লাভ হলো? সবই তো ভেঙে নষ্ট করা হয়েছে!'

'না! না!' ব্যাকুল সুরে আশ্বস্ত করল নাবু। 'এদিকে আসুন। সামনে আরও একটা টানেল আছে।'

আবর্জনার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল ওরা, নাবু ব্যাখ্যা করছে গ্যালারির ছাদ কিভাবে ধসে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর আসল প্রবেশপথটা সেই আবিষ্কার করেছিল, এ-কথা জানাতেও ভুলল না। সবশেষে বলল, 'সামনে রাশি রাশি গুপ্তধন পড়ে আছে, দেখে আপনাদের মাথা ঘুরে যাবে।'

'ঠিক আছে,' বললেন ডুগার্ড। 'সরাসরি সমাধিতে নিয়ে চলো আমাকে। আমার হাতে সময় খুব কম।'

গোলকধাঁধা অর্থাৎ বাওবোর্ডের জটিল ছক ধরে পথ দেখাল নাবু, লুকানো সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে তুলে আনল, তারপর ক্রমশ নিচু টানেল ধরে এগোল।

অবশেষে তোরণশোভিত কামরার সামনে এসে থামল ওরা। কামরার ভেতর দেয়ালচিত্র দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন ফারুকী। 'এত সুন্দর দেয়ালচিত্র জীবনে কখনও দেখিনি আমি।'

'এরকম কিছু আমিও আশা করিনি,' ফিসফিস করলেন ডুগার্ড। 'আমি মুগ্ধ, আমি ধন্য!'

'কামরার প্রতিটি দিক অমূল্য ট্রেজারে ভর্তি,' বলল নাবু। 'ওখানে এমন সব জিনিস আছে, স্বপ্নেও আপনারা দেখেননি। মাসুদ রানা খুব অল্পই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পেরেছেন, ছোট কয়েকটা বাক্সে ভরে। আর্টিফ্যাক্টের পাহাড় ফেলে রেখে গেছেন তিনি।'

'কফিনটা···কফিনটা কোথায়?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন ডুগার্ড। 'মমি! মমি!'

'ওটা ছিল সোনালি একটা কফিনে। মাসুদ রানা সেটা প্রধান পুরোহিতকে দান করেছেন। সন্ন্যাসীরা ওটা মঠে নিয়ে গেছে।'

'কর্নেল ঘুমাকে দিয়ে ওটা আনিয়ে নেব আমরা,' বললেন ফারুকী। 'আপনি চিন্তা করবেন না, হের ডুগার্ড।'

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ওঁরা, তারপর ছুটলেন। প্রথম সারির একটা স্টোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ডুগার্ড, শিশুর মত অবিরাম হাসছেন। 'অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!' একই কথা বারবার বলছেন। কাঠের একটা চেস্ট স্তূপ থেকে নামালেন তিনি, কাঁপা হাতে খুলে ফেললেন ঢাকনি। ভেতরের জিনিসগুলো দেখে বোবা হয়ে গেলেন। চেস্টের ওপর ঝুঁকে নরম সুরে কাঁদছেন।

মারটিনের হলুদ ফ্রন্ট-এন্ড ট্র্যাক্টরের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে রানা। হাইড্রলিক কন্ট্রোল অপারেট করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে, ক্রেনটাকে খাড়া করল যতটুকু পারা যায়। নদী আক্ষরিক অর্থেই ফুঁসছে, বাঁধের মাথা ছুঁতে আর বেশি সময় নেবে না। বাঁধ ভাঙবেই, তবে সময়টা আরও খানিক এগিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ও। ক্রেনের যান্ত্রিক হাত কাজ শুরু করল, বাঁধের মাথা থেকে জালে আটকানো পাথর একটা একটা করে তুলে ফেলে দিচ্ছে পানিতে।

উন্মাদের মত আচরণ করছেন ডুগার্ড। চেস্ট খুলে রাজকীয় অলঙ্কার শূন্যে ছুঁড়ছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন চারদিকে, ছুটে এসে এমন জায়গায় দাঁড়াচ্ছেন, ওগুলো যাতে তাঁর মুখ আর মাথায় পড়ে। সেই সঙ্গে অট্টহাসি হাসছেন, পাক খাচ্ছেন লাটিমের মত, আবার কখনও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেন। ফারুকীও আবেগে আপ্লুত, তবে তিনি ডুগার্ডের আচরণ হাঁ করে গিলছেন।

খানিক পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে ডুগার্ড ফিসফিস করলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্কিওলজিকাল ডিসকভারি।' এখনও তিনি কাঁপছেন, রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

'আমাদের সামনে কয়েক বছরের কাজ,' ভাবাবেগের লাগাম টেনে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন ফারুকী। 'এই অবিশ্বাস্য কালেকশনের ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে, তারপর মূল্যায়নের পালা। আবিষ্কারক হিসেবে আপনার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একেই বলে মিশরীয় অমরত্ব, আপনার নাম কেউ কোনদিন ভুলবে না, হের ডুগার্ড।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে ফারুকীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডুগার্ড। এই চিন্তাটা আগে তাঁর মাথায় ঢোকেনি। অমরত্ব লাভের এই সুবর্ণসুযোগ কেন তিনি হাতছাড়া করবেন? প্রথমে ভেবেছিলেন মামোসের ট্রেজার সবই একা দখল করবেন তিনি, কাউকে কোন ভাগ দেবেন না। ফারুকীর কথা শুনে এখন ভাবছেন, ফারাওদের মত অমর হতে বাধা কোথায়? মামোসের ট্রেজার সাধারণ লোকের দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হোক, এটা তিনি চান না, অন্তত তাঁর মৃত্যুর আগে নয়। 'না!' ফারুকীর

দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন তিনি। 'এই গুপ্তধন আমার, একা শুধু আমার! আমি মারা গেলে সব আমার সঙ্গে যাবে। আমি একটা উইল তৈরি করব। আমি মারা যাবার পর কি করতে হবে আমার ছেলেরা তা জানবে। আমার সমাধিতে থাকবে সব। ওটা হবে আধুনিক কালের ফারাও হেস ডুগার্ডের রাজকীয় সমাধি।'

মানুষটা যে সত্যিকার অর্থে পাগল, আজই প্রথম উপলব্ধি করছেন ফারুকী। তবে তিনি জানেন যে তর্ক করে কোন লাভ নেই। যা করার পরে মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে। এই বিপুল প্রত্ন নিদর্শন আরেকটা সমাধিতে হারিয়ে যাবে, তা তিনি হতে দেবেন না। মাথা নত করে আনুগত্য প্রকাশ করলেন তিনি, 'আপনি যা বলেন, হের ডুগার্ড। তবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম চিন্তা, নিরাপদে সব বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া। রাফেল আমাদেরকে নদীর কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁকে আর কর্নেলকে এখানে ডাকা দরকার, সমাধি খালি করতে হবে। সমস্ত ট্রেজার আমরা 'কন্টারে তুলে প্রক্সি ক্যাম্পে নিয়ে যাব। প্যাক করে ওখান থেকে পাঠিয়ে দেব জার্মানীতে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাফেল আর কর্নেলকে ডেকে পাঠান।' রাজি হলেন ডুগার্ড।

'নাবু, কোথায় তুমি?' চিৎকার করলেন ফারুকী।

খালি কফিনের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে তরুণ সন্ন্যাসী। উঠে এসে ফারুকীর সামনে দাঁড়াল। 'যাও, ওদেরকে ডেকে আনো...,' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, কান পাতলেন। 'ও কিসের শব্দ?'

মাথা নাড়ল নাবু, ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিল। 'শুনুন! শুনুন!'

হঠাৎ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল ফারুকীর চোখ। আওয়াজটা বহুদূর থেকে আসছে, খুবই নরম, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত।

'কিসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করলেন ডুগার্ড।

'পানি!' ফিসফিস করলেন ফারুকী। 'ছুটন্ত পানির আওয়াজ!'

'নদী!' কর্কশ শোনাল নাবুর গলা। 'টানেলে ঢুকে পড়ছে নদী!' ঘুরল সে, তোরণ হয়ে কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'আমরা এখানে আটকা পড়ব!' চেঁচিয়ে উঠে তার পিছু নিলেন ফারুকী।

'দাঁড়ান! অপেক্ষা করুন!' গলা ফাটালেন ডুগার্ডও, পিছু নিলেন ওদের। কিন্তু ফারুকী ও নাবু তাঁর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ছেন তিনি।

তবে ফারুকীর চেয়ে দ্রুত ছুটছে নাবু, গ্যাসট্র্যাপ-এর সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'নাবু! ফিরে এসো! আমি তোমাকে হুকুম করছি!' ছুটতে ছুটতে হাঁক ছাড়ছেন ফারুকী, কিন্তু নাবু থামল না। টানেলের জটিল গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল।

'ফারুকী, কোথায় আপনি?' পাথুরে করিডরে ডুগার্ডের কাঁপা কাঁপা গলা প্রতিধ্বনি তুলছে। ফারুকী শুনতে পেলেও সাড়া দিলেন না। ছুটছেন তিনি, তাঁর ধারণা নাবুকে ঠিকমতই অনুসরণ করছেন এখনও। খানিক পর মনে হলো সামনে থেকে নাবুর পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

আরও তিনটে বাঁক ঘোরার পর ফারুকী উপলব্ধি করলেন, গোলকধাঁধার

ভেতর হারিয়ে গেছেন তিনি। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা মনে হলো বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়লেন, চিৎকার করে ডাকলেন, 'নাবু! কোথায় তুমি?'

উত্তরে পিছন থেকে ডুগার্ডের আতঙ্কিত গলা ভেসে এল, 'ফারুকী! ফারুকী! এখানে আমাকে ফেলে যাবেন না!' তাঁর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

'শাট আপ!' ধমক দিলেন ফারুকী। 'বোকার মত চেঁচাবেন না!' হাঁপাচ্ছেন তিনি, নাবুর পায়ের আওয়াজ শোনার আশায় আবার কান পাতলেন। কিন্তু পানির কলকল ছলছল হাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলেন না। আওয়াজটা মনে হলো তাঁর চারদিক থেকে ভেসে আসছে। 'না! নাবু, আমাকে ফেলে যেয়ো না!' আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটলেন আবার, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছেন নিজেও জানেন না।

আঁকাবাঁকা টানেলের প্রতিটি মোচড় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে নাবু, মৃত্যুভয় তার পায়ে বিপুল গতি এনে দিয়েছে। কিন্তু মাঝখানের সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে হোঁচট খেলো সে, বাঁকা হয়ে গেল গোড়ালি, ধপাস করে পড়ে গেল সিঁড়ির ধাপে। গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল শরীরটা, লম্বা গ্যালারির নিচে এসে স্থির হলো।

অনেক কষ্টে, ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সিধে হলো সে। যদিও ছুটতে গিয়ে আবার পড়ে গেল, মচকানো গোড়ালি বিপদের সময় সাহায্য করতে রাজি নয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, ক্রল করে এগোল নাবু। দরজা পেরিয়ে এসে ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল, জেনারেটরের পাশে। টানেল থেকে সচল পানির আওয়াজ ভেসে আসছে। আওয়াজটা এখন আর নরম নয়, চাপা গর্জনের মত শোনাচ্ছে, জেনারেটরের যান্ত্রিক গুঞ্জন প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। 'ও যীশু, ও মেরী, আমাকে বাঁচাও গো!' দেয়াল ধরে সিধে হলো আবার, এক পায়ে লাফাতে লাফাতে হাঁটছে। লোয়ার লেভেলে পৌঁছুনোর আগে আরও দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়ল।

হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে সামনে তাকাল নাবু। টানেলের ছাদে ইলেকট্রিক আলো সাজানো রয়েছে, তার আলোয় নিচের সিঙ্ক-হোলটা দেখতে পেল সে। দেখেও প্রথমে চিনতে পারল না, কারণ আগের সেই চেহারা আর নেই। পানির লেভেল পালিশ করা মেঝের নিচে নয় এখন। পানিতে বিপুল একটা আলোড়ন উঠেছে। ভাসমান সেতু ভেঙে গেছে, এরইমধ্যে ডুবে গেছে অর্ধেকটা।

সিঙ্ক-হোলের ওপারের টানেলে, টাইটার পুল হয়ে, ঢুকে পড়েছে পাগলা নদী। সিঙ্ক-হোল ভরাট হয়ে গেছে, এপারের টানেলে উঠে আসছে পানি সগর্জনে। কিন্তু নাবু জানে, বাইরে বেরুবার এটাই একমাত্র পথ।

এক পায়ে লাফ দিয়ে ভাসমান একটা পন্টুনে পড়ল নাবু, কিন্তু সেটা এত দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে বসল সে, ওই অবস্থায় এক পন্টুন থেকে আরেক পন্টুনে চলে যাচ্ছে। এভাবে সিঙ্ক-হোলের ওপারে পৌঁছুল, টানেলের দেয়াল ধরে সিধে হলো আবার, একটা গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে ঝুলে থাকল। কিন্তু নদীর পানি শ্যাফটের ভেতর এখন তুমুল বেগে ঢুকছে, নাবুর শরীরের নিচের অংশ টানা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেল। পানি ঠেলে সামনে এগোতে পারছে না সে, গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে হাতটা।

মাথার ওপর টানেলের ছাদে এখনও ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে, টানেলের শেষ মাথায় টাইটার পুলে বেরুনোর চৌকো ফাঁকটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে নাবু। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে কপিকলে চড়ে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠে যাওয়া সম্ভব। শরীরের সব শক্তি এক করে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল সে, এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে হাত ঢোকাচ্ছে। আঙুলের নখ উপড়ে এল, তবু এগোচ্ছে নাবু।

অবশেষে দিনের আলো দেখতে পেল সে, টাইটার পুল থেকে ভেতরে ঢুকছে। আর মাত্র চল্লিশ ফুট এগোতে হবে। এভাবে এগোতে পারলে এ-যাত্রা বেঁচে যাবে বলে মনে হলো। কিন্তু তারপরই নতুন একটা শব্দ ঢুকল কানে। টানেলের বাইরে গহ্বরের ভেতর যেন প্রলয়কাণ্ড শুরু হলো। কি ঘটছে বুঝতে পারল নাবু। বাঁধটা এবার পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, বিপুল জলরাশি জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে টাইটার পুলে। টানেলের বিশাল ঢেউ গ্রাস করে ফেলল, টানেল ভরাট হয়ে উঠল ছাদ পর্যন্ত।

বিপুল জলরাশির ধাক্কাটা পাথর ধসের মত লাগল নাবুকে, খড়কুটোর মত ভেসে গেল সে। সিঙ্ক-হোল নিজের গভীরে টেনে নিল তাকে, পানির প্রচণ্ড চাপ হাড়-গোড় সব গুঁড়ো করে দিচ্ছে। কানের একটা ড্রাম বিস্ফোরিত হলো, হাঁ করা মুখ দিয়ে ঢুকে ফুসফুস ভরাট করে তুলল পানি। পানির নিচের গোপন শ্যাফট দিয়ে তীরবেগে ছুটল তার লাশ, পাহাড়ের দূর প্রান্তে প্রজাপতি ফোয়ারায় বেরিয়ে যাবে।

কামানের বিস্ফোরিত গোলার মত আওয়াজ তুলে বাঁধের চূড়া ভেঙে পড়ল। মুক্ত পানি উথলে উঠল আকাশে, দেখতে পেয়েই লাফ দিয়ে ফ্রন্ট-এন্ডের সীট থেকে নিচে নামল রানা, পাড় ধরে ছুটছে। কিন্তু মাত্র কয়েক পা এগোতে পারল ও, আলোড়িত পানি নাগাল পেয়ে গেল ওর। খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ছে, গহ্বরের খোলা মুখ গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে।

তীব্র স্রোত ট্র্যাক্টরটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জলপ্রপাতের মাথা থেকে খসে পড়ল ওটা, ওর নিচে শূন্যে ওটাকে এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। খসে গহ্বরের নিচে পড়ছে, উপলব্ধি করল ট্র্যাক্টরের সীটে থাকলে ওটার নিচে চাপা পড়ত ও। বিশাল মেশিনটা পুলের সারফেসে পড়ল, সাদা পানি ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীরে।

একটু পর পুলে পড়ল রানা, নিচে পা দিয়ে। তীব্র স্রোত আবার ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পানির ওপর মাথা তুলল পঞ্চাশ গজ ভাটির দিকে। চোখ থেকে চুল সরিয়ে দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলাল ও।

ওর সামনে, নদীর মাঝখানে, পাথরের ছোট একটা দ্বীপ রয়েছে। অল্প একটু সাঁতরে ওটার ওপর উঠল, ওখান থেকে গহ্বরের দু'পাশের খাড়া পাঁচিলগুলোর দিকে তাকাল। শেষবার যখন এখানে আটকা পড়েছিল, তখনকার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বাঁধ ভেঙে দিয়ে ফারাও-এর সমাধি ডুবিয়ে দেয়ার উল্লাস কর্পূরের মত উবে গেল।

ওই পিচ্ছিল পাঁচিল বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়, জানে রানা। ধরার মত কোন গর্ত নেই পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। গোটা প্রাচীর জুড়েই ফুলে আছে পাঁচিলের গা, পেরুনো অসম্ভব। সাঁতরে পিছন দিকে, জলপ্রপাতের গোড়ায় পৌঁছুনোও সম্ভব নয়।

তারপর লক্ষ করল, জলপ্রপাতের মাথা থেকে যতটা আশা করেছিল তত বেশি পানি নামছে না। তারমানে বাঁধটা পুরোপুরি এখনও ভেঙে পড়েনি, শুধু চূড়ার দিকটা ভেঙে গেছে। তবে চূড়া যখন ভেঙেছে, বাকিটা ভাঙতেও খুব বেশি সময় লাগবে না। তা যখন ভাঙবে, এই নদীতে সাঁতার কাটা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, যা করার এখুনি করা দরকার। বুট খুলে দ্বীপ থেকে ডাইভ দিয়ে নদীতে পড়ল রানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিকট আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, অবশিষ্ট বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

দুনিয়া কাঁপানো গর্জন শুরু হলো, পানির নিরেট পাঁচিল জলপ্রপাতের মাথা থেকে লাফ দিচ্ছে নিচে। গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে সাঁতরাচ্ছে রানা, দ্রুতগতি বন্যার আগে থাকার ইচ্ছা। ধেয়ে আসা ঢেউ-এর গর্জন শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। গহ্বরটা ডুবিয়ে দিয়ে ছুটে আসছে পানির তোড়, পনেরো ফুট উঁচু, চূড়ার দিকটা সাপের মত ফণা তুলে আছে। ওই চূড়ায় উঠতে হবে ওকে, তলিয়ে যাওয়া চলবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। পানিতে থাবা মেরে ঢেউ-এর ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা চালাল। অনুভব করল স্রোতটা ওর নাগাল পেয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছে মাথায়। চূড়ায় ওঠার পর পিঠটা ধনুকের মত বাঁকা করল রানা, হাত দুটো গুঁজে দিল নিজের পিছনে–ক্লাসিক বডিসার্ফার পজিশন, ঝুলে আছে ঢেউ-এর মুখে, মাথাটা সামান্য নত, শরীরের সামনের অর্ধেক অংশ পানির ওপর তোলা, ভেসে থাকছে শুধু পা ছুঁড়ে। আতঙ্কিত কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর উপলব্ধি করল, ঢেউ-এর মাথায় থাকতে পারছে ও, নিজের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আছে; আতঙ্ক কমে এল, রোমাঞ্চকর একটা শিহরণ বয়ে গেল শিরায় শিরায়।

'বিশ নট!' স্রোত আর নিজের গতি আন্দাজ করল রানা, দু'পাশের পাহাড়-প্রাচীর এত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে যে ঝাপসা লাগল চোখে। ঢেউটার মাঝখানে থাকতে চেষ্টা করছে ও, পাঁচিলের কাছ থেকে দূরে। নিজেকে প্রায় কিছুই করতে হচ্ছে না, ঢেউই ওকে বয়ে নিয়ে চলেছে। তীব্র গতি আর বিপদের আশঙ্কা উপভোগ করছে রানা।

গহ্বরের গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় বোল্ডারগুলো ডুবে গেছে, ফলে ধাক্কা খাবার ভয়টা এখন আর নেই। প্রথম এক মাইল পেরিয়ে আসার পর ঢেউ তার আকৃতি বদলাল, কারণ গিরিখাদ এদিকে চওড়া হয়ে গেছে। আরও খানিক পর দেখা গেল ঢেউটা ওকে মাথায় তুলে রাখতে পারছে না। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কাছেই বিশাল এক গাছের কাণ্ড ভাসছে, ছুটে চলেছে ঢেউয়ের সঙ্গে একই গতিতে। ভাঙা বাঁধের একটা অংশ এটা, কোন একটা ফাঁকে গুঁজে রেখেছিল মারটিন। কাণ্ড বা লগটা প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা, পিঠ দেখে মনে হচ্ছে তিমি বুঝি। কাঠুরেরা করাত দিয়ে কাটার সময় কাণ্ডের সব শাখা ছেঁটে ফেলেনি, ফলে ওটার

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকের সুরে জানতে চাইলেন, 'নাবু কোথায়? আমাকে ফেলে আপনি ছুটছিলেন কেন? ইডিয়েট, বিপদটা বুঝতে পারছেন না? টানেল থেকে বেরুবার উপায় কি?'

'আমি কি করে জানব...' রেগেমেগে শুরু করলেও, ডুগার্ডের পিছনের দেয়ালে চক মার্ক দেখে থেমে গেলেন ফারুকী। আগেও এগুলো লক্ষ্য করেছেন, তবে তাৎপর্যটুকু ধরতে পারেননি। 'চিন্তা করবেন না, মাসুদ রানা আমাদের জন্যে চিহ্ন রেখে গেছে। আসুন!' টানেল ধরে দ্রুত পায়ে এগোলেন তিনি। প্রতিটি বাঁকে পৌঁছে চক মার্ক দেখে নিচ্ছেন।

এভাবে মাঝখানের সিঁড়িতে পৌঁছুলেন ওঁরা, তবে নাবু ওঁদেরকে ছেড়ে যাবার পর ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে লম্বা গ্যালারিতে নেমে এলেন দু'জন, নামার সময় শুনতে পেলেন নদীর হিসহিস আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে—মনে হচ্ছে ঘুমন্ত একটা ড্রাগন নিঃশ্বাস ফেলছে।

ফারুকী ছুটলেন। হোঁচট খেতে খেতে তাঁর পিছু নিলেন ডুগার্ড, প্রাচীন পা দুটো ভয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। 'দাঁড়ান! প্লীজ, দাঁড়ান!' সুরটা এখন আর ধমকের নয়, করুণা ভিক্ষার; কিন্তু শুনেও শুনছেন না ফারুকী। প্লাস্টার-সীলড ডোরওয়ের কাছে পৌঁছে মাথা নিচু করলেন তিনি, দেখলেন ল্যান্ডিঙের ওপর জেনারেটরটা এখনও চলছে, সারি সারি বালবও জ্বলছে ছাদের ওপর।

ছুটে বাঁক ঘুরলেন ফারুকী, তাঁর নিচে টানেলটা ডুবে গেছে বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সিঙ্ক-হোল বা ভাসমান সেতুর কোন চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, পন্টুনগুলো কম করেও পঞ্চাশ ফুট পানির নিচে ডুবে গেছে। ডানডেরা নদী, সহস্র বছরের প্রহরী, আবার তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। গাঢ় ও দুর্ভেদ্য, সমাধির প্রবেশপথ সীল করে দিয়েছে, ঠিক যেভাবে চার হাজার বছর আগে দিয়েছিল। 'হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহম করো!' ফিসফিস করছেন ফারুকী।

বাঁক ঘুরে এগিয়ে এলেন ডুগার্ড, ফারুকীর পাশে দাঁড়ালেন। জলমগ্ন শ্যাফটের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছেন দু'জনেই। তারপর পাশের দেয়ালে হেলান দিলেন ডুগার্ড। 'আমরা আটকা পড়েছি,' বিড়বিড় করলেন তিনি, শুনে দেয়ালে ঘষা খেয়ে বসে পড়লেন ফারুকী। নাকি সুরে প্রার্থনা করছেন, অভিমানী শিশুর কান্নার মত লাগল শুনতে।

'থামুন!' হিসহিস করলেন ডুগার্ড। 'প্রার্থনায় কোন কাজ হবে না।' বাঁকা লাঠিটা দিয়ে ফারুকীর পিঠে সজোরে আঘাত করলেন। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন ফারুকী, ক্রল করে পিছিয়ে যাচ্ছেন। 'বেরুবার কোন না কোন রাস্তা নিশ্চয়ই আছে,' বললেন ডুগার্ড। 'আসুন, খুঁজে বের করি। কোথাও ফাঁক থাকলে নিশ্চয়ই ভেতরে বাতাস ঢুকছে।' আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে। 'ব্লোয়ার ফ্যানটা বন্ধ করুন, বাতাস নিজে থেকে নড়ে কিনা বুঝতে হবে।'

ডুগার্ডের নির্দেশ পেয়ে ছুটলেন ফারুকী, ফ্যানটা বন্ধ করলেন।

'আপনার কাছে সিগারেট লাইটার আছে,' বললেন ডুগার্ড, তারপর রানার ফেলে যাওয়া কাগজ আর ফটোগ্রাফগুলো দেখালেন। 'আগুন জ্বালুন। ধোঁয়া দেখে

বুঝতে চেষ্টা করি বাতাস কোন দিকে বইছে।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরে সমাধির সবগুলো লেভেলে ঘুরে বেড়ালেন ওঁরা, উঁচু করা হাতে ধরে আছেন জ্বলন্ত কাগজ, ধোঁয়ার গতিপথের ওপর নজর রাখছেন। কিন্তু টানেলের কোথাও বাতাসের কোন নড়াচড়া নেই। ক্লান্ত হয়ে আবার ওঁরা ফিরে এলেন জলমগ্ন শ্যাফটের কিনারায়।

শান্ত পানির ওপারে তাকিয়ে থেকে ডুগার্ড বিড়বিড় করলেন, 'ওটাই একমাত্র পথ।'

'নাবু হয়তো ওইপথেই বেরিয়ে গেছে,' সায় দেয়ার সুরে বললেন ফারুকী।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। সমাধির ভেতর সময় বোঝা যাচ্ছে না। নদী নিজের লেভেলে স্থির হয়ে আছে, টানেলের ভেতর সারফেসে কোন আলোড়ন নেই। শুধু সিঙ্ক-হোলের নিচে স্রোত বইছে, তারই কোমল হিসহিস আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফারুকী, 'জেনারেটরের ফুয়েল ফুরিয়ে আসছে।'

খানিক পর অন্ধকার হয়ে যাবে টানেলগুলো।

আবার কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ডুগার্ড। 'আপনাকে সাঁতরাতে হবে। যেভাবেই হোক শ্যাফটের বাইরে বেরিয়ে লোকজনের সাহায্য চাইতে হবে। আমি আপনাকে অর্ডার করছি!'

চোখে অবিশ্বাস, ডুগার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফারুকী। 'দূরত্বটা আন্দাজ করতে পারছেন? টানেলের মুখ একশো গজ দূরে। একশো গজ যদি পেরুতেও পারি, বাইরে বেরিয়ে বাতাস পাব না—বন্যায় ভরাট হয়ে গেছে নদী।'

লাফ দিয়ে সিধে হলেন ডুগার্ড, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে ফারুকীর দিকে ঝুঁকলেন। 'নাবু ওই পথে বেরিয়ে গেছে। আপনাকেও তাই করতে হবে। সাঁতার কেটে টানেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কর্নেল ঘুমা আর রাফেলকে নদীর পাশেই কোথাও পাবেন। রাফেল জানে কি করতে হবে। আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করবে সে।'

'আপনি একটা উন্মাদ!' পিছু হটছেন ফারুকী।

ডুগার্ডও সামনে বাড়ছেন। 'আমি আপনাকে হুকুম করছি, ফারুকী! আপনি আমার বেতন ভোগী কর্মচারী, ভুলে যাবেন না। আমি যা বলব আপনাকে তাই করতে হবে। আমি আপনার মনিব! নামুন, লাফ দিন পানিতে!'

'শালা বুড়ো, বলে কি!' টানেলের মেঝেতে ঘষা খেয়ে এখনও পিছু হটছেন ফারুকী।

সোনার বাঁকা লাঠিটা অত্যন্ত ভারী, সেটা দিয়ে ফারুকীর কাঁধে বাড়ি মারলেন ডুগার্ড। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ফারুকী। দ্বিতীয় বাড়িটা লাগল তাঁর নাকে, নরম হাড় ভেঙে গেল, ফুটো দিয়ে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। চিৎকার করছেন ডুগার্ড। 'মেরে ফেলব। মেরে ফেলব। এখনও কথা শোন্, তা না হলে মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলব।' আক্ষরিক অর্থে বানাচ্ছেনও তাই, একের পর এক আঘাত করে রক্তাক্ত করছেন ফারুকীকে।

'থামুন!' আহত ঘোড়ার মত চিঁচিঁ করছেন ফারুকী। 'না, প্লীজ, থামুন! শুনব,

যা বলেন শুনব! দয়া করে আর মারবেন না!' মেঝেতে ঘষা খেতে খেতে ডুগার্ডের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন, কোমর সমান পানিতে পৌঁছে থামলেন। 'আমাকে তৈরি হবার সময় দিন, হের ডুগার্ড, প্লীজ।'

লাঠিটা আবার মাথার ওপর তুলে এগিয়ে এলেন ডুগার্ড। 'এখুনি! আমার হুকুম, এখুনি যান। আমি জানি চেষ্টা করলে টানেলের খোলা মুখ আপনি খুঁজে পাবেন। আমার ধারণা ওখানে কিছু বাতাস আটকা পড়েছে, শ্বাস নিতে পারবেন। তারপর বেরিয়ে যাবেন বাইরে। গো! গো!'

আঁজলা ভরা পানি তুলে মুখের রক্ত ধুলেন ফারুকী। 'একটু সময় দিন,' কাতর অনুনয় করলেন তিনি। 'জুতো আর কাপড়চোপড় খুলতে হবে।' আসলে সময় নিতে চাইছেন তিনি।

কিন্তু পানি থেকে তাঁকে উঠতে দেবেন না ডুগার্ড। 'যা করার ওখানে দাঁড়িয়েই করুন,' নির্দেশ দিলেন, মারমুখো ভঙ্গিতে আবার লাঠিটা তুললেন মাথার ওপর।

ফারুকী বুঝতে পারলেন সোনার লাঠিটা মাথায় নেমে এলে খুলিটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। পানির কিনারায় হাঁটু ডুবে গেছে তাঁর, এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপর পায়ের জুতো খুলছেন। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে শুধু আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া সমস্ত কাপড় গা থেকে খুলে ফেললেন। তাঁর কাঁধের চামড়া থেঁতলে গেছে লাঠির আঘাতে, পিঠ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বুড়ো শয়তান বলে মনে মনে গাল দিচ্ছেন ডুগার্ডকে। বুঝতে পারছেন, অন্তত নির্দেশ পালনের ভান না করে কোন উপায় নেই। পানির নিচে ডুব দেবেন, টানেল ধরে কিছু দূর এগোবেন, পাশের দেয়াল ধরে অপেক্ষা করবেন কিছুক্ষণ, তারপর মাথা তুলে আবার ফিরে আসবেন।

'গো!' হুঙ্কার ছাড়লেন ডুগার্ড। 'আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করছেন! সময় নষ্ট করে কোনই লাভ নেই। ভুলেও ভাববেন না পানি থেকে আপনাকে আমি উঠতে দেব।'

পানির আরও নিচে নেমে এলেন ফারুকী, এবার তাঁর বুক ডুবে গেল। বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন কয়েকবার। তারপর দম আটকে ডুব দিলেন সারফেসের নিচে। পুলের কিনারায় অপেক্ষা করছেন ডুগার্ড, গাঢ় পানির নিচে ফারুকীকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু লক্ষ করলেন ফারুকীর রক্ত সারফেসের রঙ বদলে দিচ্ছে।

এক মিনিট পার হলো। তারপর হঠাৎ পানির নিচে একটা তীব্র আলোড়ন উঠল। গাঢ় সারফেসের ওপর খাড়া হলো একটা ফর্সা বাহু, হাত ও আঙুল আবেদনের ভঙ্গিতে নড়ছে। তারপর আবার ধীরে ধীরে ডুবে গেল পানির নিচে।

গলা লম্বা করে সামনে এক পা বাড়লেন ডুগার্ড। 'ফারুকী!' রাগে কাঁপছেন তিনি। 'আবার চালাকি শুরু করেছেন?'

পানির নিচে আরেকটা জোরাল আলোড়ন উঠল। সারফেসের নিচে আয়নার মত কি যেন ঝিক করে উঠল।

'ফারুকী!' গলা ফাটালেন ডুগার্ড।

যেন তাঁর হাঁক-ডাকে সাড়া দিয়েই পানির ওপর মাথাচাড়া দিলেন ফারুকী।

তাঁর ত্বক মোমের মত হলদেটে দেখাচ্ছে, সমস্ত রক্ত যেন শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, মুখটা চিৎকার করার ভঙ্গিতে পুরোপুরি খোলা, অথচ কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। তার চারপাশের পানি টগবগ করে ফুটছে, যেন বড় আকৃতির মাছের একটা ঝাঁক পানির নিচে ভোজনে মত্ত। ডুগার্ড হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন, ফারুকীর মাথার চারপাশ থেকে গাঢ় একটা ঢেউ জাগল পানিতে, সেই সঙ্গে লাল গোলাপ পাপড়ির রঙ পেল সারফেস। প্রথম এক মুহূর্ত ডুগার্ড বুঝতেই পারলেন না যে ওটা আসলে ফারুকীর রক্ত।

তারপর তিনি দেখতে পেলেন সরীসৃপ আকৃতির লম্বাটে প্রাণীগুলো ছুটোছুটি করছে পানির তলায়, মোচড় খাচ্ছে, পেঁচিয়ে ধরছে ফারুকীকে, কামড় দিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছে তার মাংস। একটা হাত আবার উঁচু করলেন ফারুকী, এবার সেটা ডুগার্ডের দিকে লম্বা করলেন, যেন সাহায্যের আশায়। হাতটা অক্ষত নয়, কয়েক জায়গায় অর্ধচন্দ্র আকৃতির ক্ষত দেখা গেল—মাংস তুলে নেয়া হয়েছে।

আতঙ্কে চেঁচাচ্ছেন ডুগার্ড, পুল থেকে পিছিয়ে আসছেন। ফারুকীর চোখ দুটো বিশাল দেখাচ্ছে, দৃষ্টিতে অভিযোগ। ডুগার্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, গলা থেকে উন্মত্ত যে চিৎকারটা বেরুচ্ছে সেটাকে মানুষের বলে চেনার উপায় নেই।

বিশাল এক ট্রপিক্যাল ঈল সারফেসের নিচ থেকে মাথা তুলল, হাঁ করে আছে, ভাঙা কাচের মত দাঁতগুলো চকচক করছে। খোলা চোয়ালে পুরে নিল ফারুকীর গলা। কুৎসিত প্রাণীটাকে গলা থেকে ছাড়াবার কোন চেষ্টাই করলেন না ফারুকী। প্রকাণ্ড ঈল মোচড় খাচ্ছে, ঘন ঘন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, দাঁত দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে গলার মাংস, আর ফারুকীর চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাকিয়ে আছেন ডুগার্ডের দিকে।

ধীরে ধীরে ফারুকীর মাথা আবার পানির নিচে তলিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সারফেসের তলায় আলোড়িত হলো পানি, মাঝে মধ্যে দু'একটা ঈলের চকচকে ও পিচ্ছিল গা ভেসে উঠল পানির ওপর। তারপর ক্রমশ শান্ত হয়ে এল পানি, এক সময় আয়নার মত স্থির ও মসৃণ দেখাল আবার।

ঘুরে দৌড় দিলেন ডুগার্ড। টানেল বেয়ে উঠে এলেন ল্যান্ডিঙে, ওখানে জেনারেটরটা এখনও সচল রয়েছে। কোথায় যাচ্ছেন জানেন না তিনি, শুধু জানেন সিঙ্ক-হোলের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে পালাতে হবে তাঁকে। সামনে খোলা কোন প্যাসেজ পেলেই হলো, ছুটছেন সেটা ধরে। মাঝখানের সিঁড়িটার গোড়ায় পৌঁছে টানেলের এক কোণে ধাক্কা খেলেন, ছিটকে পড়লেন মেঝের ওপর। কপালটা আলুর মত ফুলে উঠল।

কিছুক্ষণ পর সিধে হলেন তিনি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। দিশেহারা ও বিভ্রান্ত, কল্পনার চোখে অবাস্তব সব দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। নিজেই বুঝতে পারছেন, পাগল হতে আর বেশি দেরি নেই তার। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন, এক সময় আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি পেলেন না। তবু থামছেন না, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন।

খাড়া শ্যাফট বেয়ে টাইটার গ্যাস ট্র্যাপে নামার সময় হড়কে গেল শরীরটা।

ধাপ বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামলেন। তারপর অনেক কষ্টে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে কিভাবে তোরণটার কাছে পৌঁছুলেন, নিজেও বলতে পারবেন না। তোরণ পেরিয়ে ফারাও মামোসের সমাধিতে ঢুকলেন তিনি।

তারপরই ম্লান হয়ে গেল বালবের আলো। হলুদ আভা ছড়াচ্ছে শুধু। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন ডুগার্ড। এরপর কি ঘটবে জানেন। খানিক পর ঘটলও তাই, নিভে গেল বালব, পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল সমাধি। আবার তিনি ছুটলেন, তবে কয়েক পা এগোবার পরই ধাক্কা খেলেন কিছু একটার সঙ্গে, ছিটকে পড়লেন।

খুলি ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। পড়ার পর আর নড়ছেন না তিনি। কতক্ষণ পর মৃত্যু আসবে? ভাবছেন তিনি। কয়েক দিন লাগতে পারে, এমন কি কয়েক হপ্তা লাগাও বিচিত্র নয়। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন বোঝার জন্যে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন। গাঢ় অন্ধকার, কাজেই হাত দিয়ে ছোঁয়ার পরও কফিনটা চিনতে পারলেন না। নিরাপদ মনে করে হোক বা অন্য কিছু ভেবে, কফিনটার ভেতর ঢুকলেন ডুগার্ড। চুপচাপ শুয়ে থাকলেন তিনি, তাঁর চারদিকে একজন প্রাচীন সম্রাটের ফিউনারাল ট্রেজারের অসংখ্য স্তূপ।

সাত

সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের মঠ খালি হয়ে গেছে। গিরিখাদের নিচে তুমুল যুদ্ধের আওয়াজ শুনে সন্ন্যাসীরা নিজেদের জিনিস-পত্র নিয়ে পালিয়েছেন।

তোরণশোভিত খালি উদ্যান ধরে ছুটল রানা, দম নেয়ার জন্যে থামল সিঁড়ির মাথায় এসে। এই সিঁড়ি নীলনদের লেভেল পর্যন্ত নেমে গেছে, ওখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে বোটগুলো। হাঁপাচ্ছে রানা, ওর নিচের গভীর বেসিনে চোখ বুলাচ্ছে, যেখানে সূর্যকিরণ প্রায় সময় পৌঁছুতেই পারে না। জোড়া জলপ্রপাত থেকে ছড়িয়ে পড়া রূপোলি জলকণা সচল মেঘের মত খাদের গভীরতা ঢেকে রেখেছে, জানার কোন উপায় নেই নিমা আর মারটিন ওর জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছে কিনা, নাকি ট্রেইল ধরে মঠে পৌঁছুবার সময় তারা কোন বিপদে পড়েছে।

তারপর হঠাৎ নিমার গলা ভেসে এল নিচে থেকে, ওর নাম ধরে ডাকছে। ঘন কুয়াশার মত সচল জলকণার নিচ থেকে আসছে ডাকটা। 'রানা, ওহ, রানা!' তারপর সিঁড়ির ধাপে দেখা গেল ওকে, দ্রুত উঠে আসছে। 'থ্যাঙ্ক গড! ধরেই নিয়েছিলাম আপনাকে আর পাব না!' ছুটে এসে রানার গায়ে আছাড় খেলো ও। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা, নিমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'বাকি সবাই কোথায়?' খানিক পর নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার হাত ধরে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল নিমা। 'নিচে আসুন। সবাই ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। মারটিন আর শাফি বোটে বাতাস ভরেছেন।

ক্রেটগুলো তোলা হচ্ছে এখন।'

'রুবি?'

'ভাল আছে।'

সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ টপকে এল ওরা। শেষবার যখন দেখেছিল রানা, তারচেয়ে দশ ফুট উঁচু হয়েছে এখানে নীলনদ। নদী এখন উন্মত্ত, গতিও তীব্র। সচল জলকণার ভেতর দিয়ে কোনরকমে পাহাড়-প্রাচীরের গা দেখা যায়।

সাতটা রাবার বোট কিনারায় টেনে আনা হয়েছে। এরইমধ্যে চারটেতে বাতাস ভরা হয়েছে, কমপ্রেসড এয়ার সিলিন্ডারের সাহায্যে বাকিগুলোতেও বাতাস ভরার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বাতাস ভরা চারটে বোটে ক্রেটগুলো তোলার পর এই মুহূর্তে সেগুলো নাইলন কার্গো নেট দিয়ে সুরক্ষিত করা হচ্ছে। এগিয়ে এসে শাফির কাঁধে হাত রাখল রানা, বলল, 'ধন্যবাদ, বন্ধু। তোমার গেরিলারা বীরের মত লড়েছে। তুমি আমার জন্যে অপেক্ষাও করেছ।' পাহাড়-প্রাচীরের সরু কার্নিসে শুয়ে-বসে থাকা গেরিলাদের দিকে তাকাল ও। 'ক'জনকে হারিয়েছ তুমি, শাফি?'

'তিনজন মারা গেছে, ছ'জন আহত হয়েছে,' বলল শাফি। 'আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত, কর্নেল ঘুমা যদি আরও জোরে ধাওয়া করতেন।'

'তবু, এ-ও অপূরণীয় ক্ষতি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, কোন মৃত্যুরই ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়,' সায় দিল শাফি।

'যারা মারা গেছে,' বলল রানা, 'তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা এক লাখ ডলার করে পাবে। আর যারা আহত হয়েছে, সবাইকে দেয়া হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ত্রিশ হাজার করে পাবে বাকিরা। শাফি, তোমার বাকি লোকজন কোথায়?'

'সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গেছে। শুধু বোটগুলো হ্যান্ডেল করার জন্যে কয়েকজনকে রেখে দিয়েছি।' রানার হাত ধরে কয়েক পা হেঁটে এল শাফি, গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'বিপদ এখনও কাটেনি, রানা।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কর্নেল ঘুমা এখনও বেঁচে আছে।'

'শুধু তাই নয়,' বলল শাফি। 'অন্তত পুরো একটা কোম্পানী নিয়ে নদীর ভাটি পাহারা দিচ্ছে। আমার স্কাউটরা রিপোর্ট করেছে, দুই পাড়ের ট্রেইলের পজিশন নিয়ে আছে তারা।'

'আমাদের বোটের কথা কর্নেল জানে না, জানে কি?' রানার চোখে কঠিন দৃষ্টি।

'জানার তো কথা নয়,' বলল শাফি। 'কিন্তু আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে অনেক কথাই তার জানার কথা ছিল না, অথচ জেনে ফেলেছে। আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে তার হয়তো কোন ইনফর্মার ছিল।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'কর্নেলের কাছে এখনও হেলিকপ্টার আছে, রানা। মেঘ কেটে গেলেই নদীতে আমাদেরকে দেখতে পাবে।'

'নদীই আমাদের একমাত্র এস্কেপ রুট। আশা করা যাক আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।'

সবগুলো বোটে বাতাস ভরার কাজ শেষ হলো। একটা বোটে তোলা হলো

রুবিকে, স্ট্রেচার সহ। তারপর ধরাধরি করে বোটের কাছে নিয়ে আসা হলো আহত দু'জন গেরিলাকে, বাকি সবাই হাঁটতে পারছে। কাজটা শেষ হতে আবার রানার কাছে ফিরে এল শাফি। 'তোমার রেডিও দেখছি ফিরে পেয়েছ,' ক্যারিয়ার স্ট্র্যাপের সঙ্গে ফাইবার গ্লাস কেসটা রানার কাঁধে ঝুলতে দেখে বলল সে।

'এটা ছাড়া বিপদ এড়ানো যাবে না,' জবাব দিল রানা। 'শাফি, তুমি রুবির বোটে থাকো। সামনের বোটে আমি নিমাকে নিয়ে থাকব।'

'আমাকে সামনে থাকতে দিলে ভাল হত,' বলল শাফি।

'নদী সম্পর্কে কি জানো তুমি?' রানা হাসছে না। 'এই নদী পথে একমাত্র আমিই আসা-যাওয়া করেছি।'

'সে তো বহু বছর আগের কথা,' বলল শাফি।

'তখন আরও অনভিজ্ঞ ছিলাম। শাফি, তর্ক করো না। আমার পিছনে থাকবে তুমি, তোমার পিছনে মারটিন। তোমার গেরিলাদের মধ্যে আর কেউ আছে, এই নদী সম্পর্কে ধারণা রাখে?'

'আমার সব লোকই ধারণা রাখে,' বলে নিজের লোকদের উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করল শাফি। চারজন গেরিলা ছুটে এসে বাকি চারটে বোটে উঠে পড়ল। সবাই যার যার বোটে চড়েছে কিনা দেখে নিয়ে, সবার শেষে নিজের বোটে উঠল রানা। ওর নির্দেশে প্রত্যেকে বৈঠা হাতে নিল, রুবি আর আহত গেরিলা দু'জন বাদে।

শাফি মিছে গর্ব করেনি, গেরিলারা সত্যি সত্যি দক্ষ হাতে বৈঠা চালাচ্ছে। দেখতে না দেখতে নীলনদের মূল স্রোতে গিয়ে পড়ল সাত বোটের ছোট্ট বহরটা।

প্রতিটি বোটে ষোলোজন লোকের জায়গা হবার কথা, সে তুলনায় লোক বা কার্গো কমই তোলা হয়েছে। কোন বোটেই নয়জনের বেশি লোক নেই। তবে গুপ্তধন ভর্তি ক্রেটগুলো কম ভারী নয়।

'সামনে বিপজ্জনক পানি,' নিমাকে গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'সেই সুদান সীমান্ত পর্যন্ত।' বোটের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ও, হাতে হাল, সামনেটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। ওর পায়ের কাছে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে নিমা, ঝুলে আছে একটা সেফটি স্ট্র্যাপ ধরে।

জলপ্রপাতের নিচে জোরাল স্রোতটাকে আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে এল ওরা, সরু একটা ফাঁক বরাবর বহরটাকে এক লাইনে নিয়ে এল, ওই পথে পশ্চিম দিকে ছুটছে নদী। আকাশের দিকে তাকাল ও, দেখল পানি ভর্তি কালো মেঘ খুব নিচে নেমে এসেছে, যেন পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলোকে ছুঁয়ে দেবে।

'ভাগ্য বোধহয় আমাদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' নিমাকে বলল ও। 'এই আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার নিয়ে বেরুলেও ওরা আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।'

হাতে বাঁধা রোলেক্সের দিকে তাকাল রানা, পানির ছিটা লেগে ঝাপসা হয়ে আছে কাঁচ। 'সন্ধে হতে আরও দু'ঘণ্টা।' পিছন দিকে তাকাল ও। বাকি বোটগুলো ডুবু ডুবু হয়ে অনুসরণ করছে ওদেরকে। বোটগুলো হলুদ রঙের, গিরিখাদের গাঢ় ছায়া আর কুয়াশার ভেতরও পরিষ্কার দেখা যায়। একটা হাত তুলে নাড়ল রানা,

উত্তরে দ্বিতীয় বোট থেকে শাফিও তাই করল। দাড়ির ভেতর তার হাসি দেখতে পেল রানা।

নদী এরপর এঁকেবেঁকে, মোচড় খেয়ে এগিয়েছে। কোথাও কোথাও বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে সরু পথ ধরে এগোতে হলো ওদেরকে। স্রোত এত তীব্র, বৈঠা না চালালেও বোট ছুটছে। গিরিখাদের ভেতর বর্ষার পানি ঢোকায় নদীর ওপর জেগে থাকা অনেক খুদে দ্বীপ বা বড় আকারের বোল্ডার ডুবে গেছে, তবে সারফেসের ঠিক নিচেই রয়েছে ওগুলো, বোঝা যাচ্ছে স্রোত বাধা পেয়ে ফেনা তৈরি হতে দেখে। বন্যার পানি দু'দিকের পাড় ধরেই অনেক ওপরে উঠে গেছে, উপ-খাদের প্রাচীর ছুঁই-ছুঁই করছে। একটা বোট যদি উল্টে যায়, বা বোট থেকে কেউ যদি পড়ে যায়, পিছিয়ে গিয়ে বোট বা আরোহীকে উদ্ধার করা অন্তত এই নদীতে সম্ভব নয়।

বোটের পিছনে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে আছে রানা। মনে মনে শিউরে উঠল, কারণ খানিক দূর থেকে শুরু হয়েছে নদীর উন্মত্ততা। ওর গোটা জগৎ উপ-খাদের আকাশ ছোঁয়া প্রাচীরের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ল। মুখে পানির ছিটা লাগছে, নাকি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, খেয়াল থাকল না। নদীর নিচে প্রায় খাড়া ঢাল রয়েছে, ফলে তীব্র স্রোত বোটগুলোকে উল্টে দিতে চাইছে। ঢালের নিচে সমতল সারফেসে নামার সময় একটা বোট থেকে দু'জন ছিটকে পড়ল। একজন লোককে দ্রুত ধরে ফেলায় বেঁচে গেল সে, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটার মাথা ঠুকে গেল একটা বোল্ডারের সঙ্গে, ফেটে চৌচির হয়ে গেল খুলি। ডুব দেয়ার পর আর সে উঠল না। কেউ কথা বলল না বা শোক প্রকাশ করল না। সবাই যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

নদীর গর্জনে কান পাতা দায়। সেই শব্দকে ছাপিয়ে উঠল নিমার চিৎকার, 'রানা, হেলিকপ্টার!'

পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় নেমে আসা কালো মেঘের দিকে তাকাল রানা, দেখতে না পেলেও এঞ্জিনের আওয়াজ ঢুকল কানে। 'মেঘের আড়ালে!' পাল্টা চিৎকার করল ও, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে পানির ছিটা আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছল চোখ থেকে। 'এই মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ওদের ওপর দ্রুত নেমে এল আফ্রিকান রাত্রি। ঘনায়মান সন্ধ্যায় কোন রকম সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়ে আরেকটা বিপদ লাফ দিয়ে পড়ল ওদের ওপর। এক মুহূর্ত আগে নদীর মসৃণ বিস্তৃতি ধরে দ্রুতগতিতে ছুটছিল বোট, পরমুহূর্তে ওদের সামনে উন্মুক্ত হলো পানি, নদী ওদেরকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর মনে হলো অনন্তকাল ধরে খসে পড়ছে ওরা, অথচ পতনটা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়। জলপ্রপাতের নিচে পড়ে ডুবে গেল ওরা; বোট, কার্গো আর আরোহী জট পাকিয়ে একাকার। নদী এখানে স্রোতবিহীন, বিরাট একটা জায়গা জুড়ে ফুঁসছে, আবার বিপুল বেগে ধাবিত হবার জন্যে এক করছে যেন সমস্ত শক্তি।

একটা বোট উল্টো হয়ে ভাসছে। বাকি বোটগুলোর আরোহীরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে দ্রুত বৈঠা চালিয়ে ছুটে গেল সেদিকে। পানি থেকে তুলে নিল ডুবন্ত আরোহীদের, উদ্ধার করল ভাসমান বৈঠা আর ইকুইপমেন্ট। সবার মিলিত

চেষ্টায় বোটটাকেও সিধে করা সম্ভব হলো। ইতিমধ্যে গিরিখাদ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ক্রেটগুলো গুনতে হয়,' নির্দেশ দিল রানা। 'ক'টা হারালাম?'

খানিকপর মারটিনের চিৎকার শুনে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো রানার। 'সব মিলিয়ে তেরোটা ক্রেট!' কোন বাক্সই পানিতে পড়েনি, কৃতিত্বটা আসলে কার্গো নেটের। তবে সবাই ওরা সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ভেজা শরীরে কাঁপছে। এই অন্ধকারে এগোনোর চেষ্টা আত্মহত্যা করতে চাওয়ার নামান্তর। কাছাকাছি বোটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে শাফির চোখে তাকাল রানা।

শাফি বলল, 'পাহাড়ের ওদিকটার একটা ভাঁজে পানি খানিকটা শান্ত।' পুলের লেজের দিকটা হাত তুলে দেখাল সে। 'রাত কাটানোর জন্যে কার্নিস পাওয়া যেতে পারে।'

ঠিক ভাঁজ নয়, পাহাড়ের গায়ে সরু একটা ফাটল দেখল ওরা। ফাটলটার মুখেই অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পকর্মের মত উদ্ভট আকৃতির একটা গাছ, বেশ অনেকগুলো শাখা, তবে একটাতেও কোন পাতা নেই। ওটায় বোটের রশি বাঁধল ওরা। রশির দৈর্ঘ্য কমবেশি রাখা হলো, ফলে বোটগুলো পাশাপাশি ভেসে থাকছে। গরম খাবার বা পানীয় কল্পনাও করা যায় না, বেয়নেটের ডগা দিয়ে টিনের কৌটা খুলে শুকনো কিছু খাবার মুখে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

নিজের বোট থেকে লাফ দিয়ে রানার বোটে চলে এল শাফি, বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কথা বলল কানে কানে। 'এই মাত্র রোল কল করলাম। জলপ্রপাত থেকে পড়ার সময় আরও একজনকে হারিয়েছি আমরা। এখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'লীডার হিসেবে আমি বোধহয় ভাল করছি না,' বলল রানা। 'কাল সকাল থেকে তুমি সামনে থাকবে।'

'তুমি দায়ী নও।' রানার কাঁধে চাপ দিল শাফি। 'এরচেয়ে ভাল করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। দায়ী আসলে শেষ ওয়াটারফলটা···' থেমে গেল সে, দু'জনই ওরা অন্ধকারে কান পেতে জলপ্রপাতের গর্জন শুনছে।

'কতদূর এলাম আমরা?' জানতে চাইল রানা। 'আর কতদূর যেতে হবে?'

'বলা প্রায় অসম্ভব, তবে আমার ধারণা অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছি। কাল দুপুরের মধ্যে সীমান্তে পৌঁছে যাব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শাফি জিজ্ঞেস করল, 'ক'তারিখ আজ?'

'ভুলে গেছি।' রোলেক্সটা চোখের সামনে তুলে আলোকিত ডায়ালে তাকাল রানা। 'গুড গড! আজ ত্রিশ তারিখ!'

'তোমার পিক-আপ এয়ারক্রাফট পরশু রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুবে,' মনে করিয়ে দিল শাফি।

'হ্যাঁ, পয়লা এপ্রিলে,' বলল রানা। 'আমরা সময় মত পৌঁছুতে পারব তো?'

'উত্তরটা তোমার কাছ থেকে চাই আমি,' বলল শাফি, কিন্তু হাসছে না। 'তোমার পাইলট কতটুকু বিশ্বস্ত? পৌঁছুতে দেরি করার আশঙ্কা কতটুকু?'

'ইস্কান্দার প্রফেশন্যাল, পৌঁছুতে কখনোই দেরি করেন না,' জোর দিয়ে বলল

রানা। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'রোজিরেস পৌঁছে তোমাকে যদি ট্রেজারের ভাগ দিয়ে দিই, ওগুলো নিয়ে কি করবে তুমি?' একটা ক্রেটে জুতোর ডগা ঠেকাল রানা। 'সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?'

'তোমাদেরকে প্লেনে তুলে দেয়ার পর কর্নেল ঘুমাকে পিছনে ফেলার জন্যে আরও কিছুদূর ছুটতে হবে আমাদের, কাজেই অতিরিক্ত বোঝা বইতে রাজি নই। আমার ভাগ তোমার সঙ্গে থাকবে। বিক্রিও করবে তুমি–এখানে যুদ্ধ চালাবার জন্যে নগদ টাকা দরকার আমার।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'বিশ্বাস না করলে বন্ধু কিসের!'

'বন্ধুদের ঠকানো সবচেয়ে সহজ–ওরা বেঈমানী আশা করে না,' বলল রানা, শুনে ওর কাঁধে হালকা ঘুসি মারল শাফি।

'খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। কাল হয়তো বিকেল পর্যন্ত একটানা বৈঠা চালাতে হবে।' বোটের ওপর দাঁড়াল শাফি। লাফ দিয়ে পাশের বোটে চলে গেল। রুবি তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে।

নিমার দিকে ঝুঁকে হাত বাড়াল রানা। টেনে এনে ওর দুই হাঁটুর মাঝখানে বসাল, নিমা বাধা না দিয়ে হেলান দিল ওর বুকে, ভেজা কাপড়ে একটু একটু কাঁপছে। খানিক পর কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেল। নিমা ফিসফিস করে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আপনি একটা হটওয়াটার-বটল।'

'আমাকে খুব কাছে থাকতে দেয়ার এটা একটা মস্ত সুবিধে,' নিঃশব্দে হাসছে রানা, নিমার মাথায় আদর করে হাত বুলাচ্ছে। জবাবে নিমা আর কিছু বলল না, তবে নিতম্ব ঘষে আরও একটু কাছে সরে এল। আরও খানিক পর ঢিল পড়ল ওর পেশীতে, ঘুমিয়ে পড়ল রানার বুকে মাথা রেখে।

রানাও সাংঘাতিক ক্লান্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল ধরে থাকায় তালুতে ফোস্কা পড়ে গেছে, তবু নিমার মত এত সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারল না। রোজিরেস এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে পারার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, কাজেই নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে এগোনো আর কর্নেল ঘুমাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা উঁকি দিচ্ছে ওর মনে। নদী আর কর্নেল ঘুমা পরিচিত শত্রু, কাজেই কিভাবে লড়তে হবে জানে। কিন্তু পরিচিত শত্রু ছাড়াও অন্য অনেক কিছু বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, অচিরেই সে-সবের মুখোমুখি হতে হবে ওকে।

ওর বাহুবন্ধনে বিড়বিড় করে কি যেন বলল নিমা, বুঝতে পারল না রানা। স্বপ্ন দেখছে মেয়েটা, ঘুমের মধ্যে কথা বলছে। আদর করে আবার ওর মাথায় হাত বুলাল রানা, স্থির হয়ে গেল নিমা। কিন্তু খানিক পর আবার কথা বলল ও, এবার কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। আমি চাই আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন না। কিভাবে আপনাকে আমি এ-সব···' শেষ দিকে কথাগুলো জড়িয়ে গেল, কি বলতে চায় বোঝা গেল না।

রানার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠেছে, নিমার কথাগুলো মনের সন্দেহ আর আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ। বাকি রাতটুকু প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিল ও, ঘুম এলেও খানিক পরপর ভেঙে যাচ্ছে।

*

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আবার নদীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো। মাথার ওপর মেঘ এখনও নিচে নেমে আছে, কোথাও এতটুকু ভাঙনও ধরেনি; খানিক পর পর এক পশলা করে বৃষ্টিও হচ্ছে। সারাটা সকাল ধরে বিরতিহীন ছুটল বোট, ধীরে ধীরে নদীর মেজাজ শান্ত হয়ে আসছে। স্রোত এখন আর আগের মত তীব্র নয়, পাড়গুলো নয় দুর্গম বা খাড়া।

দুপুরের দিকেও মাথার ওপর মেঘ জমাট বেঁধে থাকল। নদীর এমন একটা বিস্তৃতিতে পৌঁছুল ওরা, পানি এখানে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য ব্লাফ আর হেডল্যান্ডের ভেতর দিয়ে। ইতিমধ্যে নিরাপদ পথ চিনতে দক্ষ হয়ে উঠেছে রানা, বোধহয় সেজন্যেই কোন রকম বিপদের মধ্যে না পড়ে বিস্তৃতিটুকু পার হয়ে এল বোটগুলো। 'সম্ভবত সুদানের সমতল প্রান্তরে পৌঁছুতে যাচ্ছি আমরা, নদী তাই চওড়া হয়ে যাচ্ছে,' নিমাকে বলল রানা।

'রোজারিস আর কত দূরে?' জানতে চাইল নিমা।

'তা বলতে পারব না, তবে সীমান্তের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।'

নদী শান্ত হওয়ায় রানা আর শাফির বোট এখন পাশাপাশি চলে এসেছে। একটা বাঁক ঘুরল ওরা, সামনে আরও চওড়া দেখাল নদীকে, কোথাও কোন আলোড়ন নেই। তবে পরবর্তী বাঁক ঘুরতেই নাক বরাবর সামনে নদীর মাঝখান থেকে উথলে উঠতে দেখল একটা ফোয়ারাকে। সচল ফোয়ারা, ওদের দিকে ছুটে আসছে। পরমুহূর্তে অটোমেটিক ফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল, একটা রুশ আরপিডি থেকে আসছে।

লাফ দিয়ে নিমার গায়ে পড়ল রানা, নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে, শুনতে পেল পাশের বোট থেকে গেরিলাদের উদ্দেশে চিৎকার করছে শাফি। 'রিটার্ন ফায়ার! মাথা নিচু রাখতে বাধ্য করো ওদের!'

গেরিলারা বৈঠা ফেলে দিয়ে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। নদীর পাড় সামান্য মোচড় খেয়েছে, সেই মোচড়ের ভেতরের কোণ থেকে হামলা করা হয়েছে, গেরিলারা পাল্টা গুলি করছে সেদিকে।

শত্রুপক্ষ পাথর আর ঝোপের আড়ালে রয়েছে, গেরিলাদের সামনে নির্দিষ্ট কোন টার্গেট নেই। তবে এ-ধরনের অ্যামবুশে পড়লে বিরতিহীন পাল্টা গুলি করার কোন বিকল্প নেই, আক্রমণকারীরা যাতে মাথা নিচু রাখতে বাধ্য হয়, যাতে লক্ষ্যস্থির করতে না পারে।

নিমার মাথার কাছে বোটের নাইলন স্কিন ভেদ করল একটা বুলেট, মেটাল অ্যামুনিশন ক্রেটে লাগল। বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে আসছে, বোটগুলোর ফুটো হওয়া ঠেকানোর উপায় নেই। একজন গেরিলার মাথায় লাগল একটা বুলেট, খুলির ওপর একটা গভীর খাল কেটে বেরিয়ে গেল, ছিটকে পানিতে পড়ে গেল লোকটা। যতটা না ভয়ে, তারচেয়ে বীভৎস দৃশ্যটা অসুস্থ করে তুলল নিমাকে। নিহত লোকটার রাইফেল ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা, পাড় লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন।

বোটগুলো এখনও স্রোতের সঙ্গে ভাটির দিকে ছুটছে, কেউ হাল ধরে না

থাকায় অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। অ্যামবুশকে পাশ কাটিয়ে পরবর্তী বাঁক ঘুরতে এক মিনিটের বেশি লাগল না। খালি রাইফেল ফেলে দিয়ে শাফির দিকে তাকাল রানা। 'রিপোর্ট করো, শাফি!'

'আমার বোটে একজন মারা গেছে,' বলল শাফি।

প্রতিটি বোট থেকে রিপোর্ট চাইল রানা। মারা গেছে ওই একজনই, আহত হয়েছে তিনজন। তবে আহত কারও অবস্থা গুরুতর নয়। তিনটে বোট ফুটো হয়েছে, তবে প্রতিটি খোল আলাদা আলাদা ওয়াটারপ্রুফ কমপার্টমেন্ট জোড়া লাগিয়ে তৈরি হওয়ায় এখনও ভেসে আছে পানির ওপর।

বোট নিয়ে রানার পাশে চলে এল শাফি। 'অথচ আমি ভাবছিলাম কর্নেল ঘুমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি।'

'প্রথম হামলাটা হালকার ওপর দিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'নদীতে ওরা আমাদেরকে আশা করেনি, ফলে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, কর্নেল ঘুমাকে আর চমকে দেয়া যাবে না। বাজি ধরতে পারো, রেডিওতে কথা বলছে ওরা। ঘুমা এখন জানে কোথায় রয়েছি আমরা, যাচ্ছিই বা কোনদিকে।' মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল শাফি। 'মেঘ কেটে গেলে বিপদ হবে।'

'সুদান সীমান্ত আর কত দূরে?'

'আর বোধহয় দু'ঘণ্টার পথ।'

'বর্ডার ক্রসিঙে গার্ড থাকে?' জানতে চাইল রানা।

'না। দু'দিকেই ফাঁকা ঝোপ।'

'ফাঁকা থাকলেই হয়,' বিড়বিড় করল রানা।

গোলাগুলি থেমে যাবার ত্রিশ মিনিট পর আবার ওরা হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল। মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে ভাটির দিকে। বিশ মিনিট পর আবার শোনা গেল রোটরের আওয়াজ, তবে এবারও মেঘের আড়ালে থাকায় দেখা গেল না। উজানের দিক থেকে এল, খানিক পর আবার ভাটির দিকে গেল। 'ঘুমার মতবলটা কি বলো তো?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল শাফি। 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে নদীর ওপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মেঘের নিচে আমাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছে না।'

'নিজের লোকজনকে ভাটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমাদের সঙ্গে বোট আছে, কোনদিকে যাচ্ছি আন্দাজ করে নিয়েছে। হয়তো রোজারিস এয়ারস্ট্রিপ সম্পর্কেও তার জানা আছে। নদীর কাছাকাছি ওটাই একমাত্র পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ। পৌঁছে হয়তো দেখব ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

নিজের বোট আরও কাছে সরিয়ে আনল শাফি, তারপর বলল, 'আমার ভাল ঠেকছে না, রানা। সরাসরি ওদের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি। কিছু একটা পরামর্শ দাও।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নদীর এই অংশটা তুমি চিনতে পারছ না? এখনও বুঝতে পারছ না ঠিক কোথায় আমরা রয়েছি?'

মাথা নাড়ল শাফি। 'সীমান্ত পেরুবার সময় নদীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকি

আমরা। তবে পুরানো সুগার মিলটা চিনতে পারব, ওখানে পৌঁছুবার পর। এয়ারস্ট্রিপ থেকে তিন মাইল উজানে ওটা।'

'পরিত্যক্ত?'

'হ্যাঁ,' বলল শাফি। 'বিশ বছর আগে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই খালি।'

'আকাশে মেঘ থাকায় এক ঘণ্টার মধ্যে সন্ধে হয়ে যাবে,' বলল রানা। 'নদী শান্ত, কাজেই রাতেও আমরা বোট চালাতে পারি। ঘুমা হয়তো তা আশা করছে না। অন্ধকারে তাকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হতে পারে।'

'এই তোমার পরামর্শ?' শাফির গলায় ক্ষোভ। 'এ যেন চোখ বুজে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া।'

'আরও ভাল প্ল্যান পেতে হলে তথ্য দাও আমাকে,' বলল রানা। 'ইস্কান্দার কাল কখন পৌঁছুবেন জানাও। এখন ঠিক কোথায় রয়েছি বলো।'

শাফি কথা বলল না।

ওদের মত গেরিলারাও খুব টেনশনে ভুগছে। সন্ধে হয়ে এলেও, হাতের অস্ত্র দুই পারের দিকে তাক করে রেখেছে তারা। আরও অনেকক্ষণ পর শাফি বলল, 'আমরা সম্ভবত এক ঘণ্টা আগেই সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি। সুগার মিলটা আর বেশি দূরে হতে পারে না।'

'অন্ধকারে ওটাকে তুমি খুঁজে পাবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নদীর পারে পাথরের তৈরি একটা জেটি আছে,' বলল শাফি। 'ওখান থেকে কার্গো বোটগুলো খার্তুমে চিনি নিয়ে যেত।'

ঝপ করে রাত নেমে এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল ওদের জগৎ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, পাড় থেকে এখন আর ওদেরকে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হতে বোটগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে নাইলন রশি দিয়ে বেঁধে নিল ওরা, কোনটা যাতে আলাদা হয়ে না যায়। বৈঠা চালাতে নিষেধ করল রানা, কোন রকম শব্দ না করাই ভাল। স্রোতের টানে নিঃশব্দে ছুটে চলছে বোটগুলো। ডানদিকের তীর ঘেঁষে যাচ্ছে ওরা, মাঝে-মধ্যেই নদীর তলায় ঘষা খেয়ে আটকে যাচ্ছে বোট, তখন পানিতে নেমে ঠেলে গভীর জলে আনতে হচ্ছে।

অকস্মাৎ রোজিরেস-এর পাথুরে জেটি ওদের সামনে যেন লাফ দিয়ে উদয় হলো, সময় মত দেখতে না পাওয়ায় রানার বোট ধাক্কা খেলো ওটার সঙ্গে। বোট থেকে কয়েকজন আরোহী ছিটকে পড়লেও, কেউ আহত হলো না। পানি এখানে কোমর সমান, বোট টেনে পাড়ে তুলতে কোন অসুবিধে হলো না। বিশজন গেরিলাকে আখ খেতের ভেতর ছড়িয়ে দিল শাফি, কর্নেল ঘুমার আকস্মিক হামলা যাতে ঠেকানো সহজ হয়।

নিমাকে বোট থেকে নামতে সাহায্য করল রানা, তারপর রুবিকে নিতে এল। হেসে উঠে রানার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল রুবি, জানাল নিজেই নামতে পারবে। দীর্ঘ বিশ্রামে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। তবে রানাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

রুবি তীরে নামতেই রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা, রুবি। জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। ডেবরা মারিয়াম থেকে নিমা আপনাকে যে মেসেজটা পাঠাতে

বলেছিলেন, সেটার কি হলো?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রুবি। 'মিশরীয় দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে আল মাসুদকে মেসেজটা আমি জানিয়ে দিয়েছি। ফিরে এসে আপনার বান্ধবীকে বলেওছি কথাটা, উনি আপনাকে বলেননি?'

'ওঁর হয়তো মনে নেই,' বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা। 'তাছাড়া, ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু, ধন্যবাদ, রুবি।'

অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো বোট থেকে দ্রুত নামানো হলো। খালি বোট পানি থেকে তুলে লুকিয়ে রাখা হলো আখ খেতের ভেতর। অন্ধকারে কাজ চলছে, আলো জ্বালতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা। গেরিলাদের মধ্যে ক্রেটগুলো ভাগ করে দেয়া হলো। নিজের কাঁধে মারটিনও একটা বাক্স তুলল। রানার এক কাঁধে রেডিও, অপর কাঁধে ইমার্জেন্সী প্যাক ঝুলছে, মাথায় নিয়েছে একটা ক্রেট–ফারাও-এর সোনার ডেথ-মাস্ক আর টাইটার কাঠের মূর্তি আছে ওটায়।

প্রথমেই স্কাউটদের ছোট একটা দলকে এয়ারস্ট্রিপে পাঠিয়ে দিল শাফি, ওরা যাতে অ্যামবুশের মধ্যে না পড়ে। তারপর আগাছায় ঢাকা ট্রেইল ধরে এক লাইনে রওনা হলো মূল দল। এক মাইলও এগোয়নি, মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিল কাস্তে আকৃতির চাঁদ। তারপর একটা দুটো করে তারাও দেখা গেল। রাতের কালো আকাশের গায়ে সুগার মিলের চিমনিটা চিনতে পারল ওরা।

কোন অঘটন ছাড়াই রাত তিনটের দিকে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুল ওরা। ইতিমধ্যে চাঁদ ডুবে গেছে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অ্যামুনিশন ক্রেটগুলো সাজিয়ে রাখা হলো, পাহারায় থাকল কয়েকজন গেরিলা। নিমা আর রুবি আহত গেরিলাদের দেখাশোনা করছে। শাফির মেডিকেল কিটটা সাংঘাতিক কাজে লাগল। ছোট্ট একটা আগুন জ্বালা হয়েছে, পর্দার ভেতর, তারই আভায় আহতদের সেবা করছে ওরা। এক পাশে সরে এসে রেডিওর এরিয়াল লম্বা করল রানা, রেডিও নাইরোবি ধরে চাকা-চাকার গান শুনল কিছুক্ষণ। আগেও শুনেছে, মেয়েটার গলা ওর ভালই লাগে। তবে একটু পরই রেডিও বন্ধ করে দিল, ব্যাটারি অপচয় করতে চায় না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা, ভোর হবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ঘুম এল না–বেঈমানীর আভাস পেয়ে বড় বেশি রেগে আছে ও।

আট

'ক্রীতদাস টাইটা! সাড়া দাও, ক্রীতদাস টাইটা! আমি ফারাও তোমাকে ডাকছি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?' সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে রেডিওর সাহায্যে ডাকাডাকি শুরু করেছে রানা।

তারপর শাফিকে বলল, 'ইস্কান্দারকে আমি চিনি, সময়ের হিসেব করেই

রওনা হবেন, যাতে খুব ভোরে ল্যান্ড করতে পারেন এখানে।'

'যদি আদৌ রওনা হন আর কি,' শাফির গলায় সংশয়।

'ইস্কান্দার? ওঁকে তুমি চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। বহু বছর আগের কথা, ইস্কান্দার একটা উপকার করেছিলেন আমার। অনেক বার ভেবেছি ঋণটা শোধ করতে হবে, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এভাবে তিন বছর পার হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ এক বন্ধুর কাছ থেকে পুরানো একটা হারকিউলিস কার্গো প্লেন খুব সস্তায় কেনার প্রস্তাব পাই আমি, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ইস্কান্দার একজন পাইলট। প্লেনটা উপহার হিসেবে পেয়ে বাপ-বেটা দু'জনেই সাংঘাতিক খুশি হয়েছিল। ওই প্লেন ওরা যে চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করবে, অবশ্য সেটা আমার জানা ছিল না, অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায়ও না।'

কাঁধ ঝাঁকাল শাফি। 'তাহলে হয়তো আসবেন।'

'অবশ্যই আসবেন! ইস্কান্দার কখনোই হতাশ করেননি আমাকে।' মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিয়ে আবার ডাকল রানা, 'ক্রীতদাস টাইটা! ক্রীতদাস টাইটা। সাড়া দাও!'

হঠাৎ দাঁড়াতে শুরু করল নিমা, বলল, 'এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি আমি! শুনুন!'

রানা ও শাফি ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে উত্তর আকাশের দিকে তাকাল।

'ওটা হারকিউলিস নয়,' হঠাৎ বলল রানা, বিস্মিত দেখাল ওকে। ঘুরে দক্ষিণে তাকাল, নদীর দিকে। 'তাছাড়া, শব্দটা আসছে উল্টোদিক থেকে।'

'ঠিক,' সায় দিল শাফি। 'সিঙ্গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। রোটরের শব্দও পাচ্ছি আমি।'

'প্রক্সির হেলিকপ্টার!' বলল রানা। 'হামলা করতে আসছে।'

তবে না, আওয়াজটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। ঢিল পড়ল রানার পেশীতে। 'ওরা আমাদের দেখতে পায়নি। বোটগুলো লুকিয়ে রাখায় লাভ হয়েছে।'

ঝোপের আড়ালে ফিরে এল ওরা। রেডিওটা আবার অন করল রানা। কিন্তু ইস্কান্দারের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশ মিনিট পর জেট রেঞ্জারের ফিরে আসার আওয়াজ পেল ওরা। খানিকক্ষণ কান পেতে শোনার পর রানা বলল, 'ফিরে যাচ্ছে আবার।' কিন্তু দশ মিনিট পর আবার ভেসে এল রোটরের শব্দ।

'ঘুমা কিছু একটা করছে ওদিকে,' বলল শাফি, চেহারায় অস্বস্তি।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়তো বোটগুলো দেখতে পেয়েছে,' বলল শাফি। 'হামলা করার আগে আরও লোকজন এনে জড়ো করছে।' ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে কান পাতল সে। খানিক পর ফিরে এল রানার পাশে। রানা রেডিওতে কথা বলছে। 'তুমি ডাকতে থাকো। আমি যাই, গেরিলাদের সাবধান করে দিই।'

পরবর্তী তিন ঘণ্টা নীলনদের ওপর দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করল প্রক্সির জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। তবে নতুন কিছু ঘটছে না। রোটরের আওয়াজে অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছে ওরা, শব্দটা হলে রেডিও থেকে এক-আধবার শুধু মুখ তুলছে রানা। তারপর হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও, ইস্কান্দারের গলা ভেসে এল। 'ফারাও! ক্রীতদাস টাইটা বলছি। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল রানা, 'আমি ফারাও। মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাও, টাইটা।'

'পৌছুতে আরও এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট লাগবে,' ইস্কান্দারেরই গলা, কোন সন্দেহ নেই।

মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে নিমা আর রুবির দিকে তাকাল রানা। 'ইস্কান্দার রওনা হয়ে গেছেন, ওঁ...'

মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল, নদীর দিক থেকে ভেসে এল একে-ফরটিসেভেনের বিরতিহীন গর্জন। কয়েক সেকেন্ড পর দুটো গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হলো। গুঙিয়ে উঠল রানা, 'সর্বনাশ! ঘুমা হামলা করেছে!'

ছোঁ দিয়ে আবার মাইক্রোফোনটা তুলল রানা। 'ইস্কান্দার! প্রতিপক্ষ এখানে পৌছে গেছে। ল্যান্ড আপনাকে করতেই হবে, তবে বুঝে-শুনে।'

'কোন চিন্তা করবেন না,' জবাব দিল ইস্কান্দার। 'আপনি মুকুট পরে থাকুন, স্যার। আমি ঠিকই পৌছুব, আগুন থেকে তুলেও নেব আপনাদের।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা নদীর কিনারা বরাবর গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ বাড়ল, একে-ফরটিসেভেনের শব্দ মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। ধীরে ধীরে কাছে সরে আসছে যুদ্ধটা। পরিষ্কার বোঝা গেল, ছড়িয়ে থাকা গেরিলারা পিছু হটছে। বিশ মিনিট পরপর রোটরের আওয়াজও গেল ওরা, প্রতিবার আরও সৈন্য এনে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছে কর্নেল ঘুমা।

এয়ারস্ট্রিপের কাছাকাছি ঝোপের ভেতর সুস্থ ও সমর্থ পুরুষ বলতে শুধু রানা আর মারটিন, বাকি সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছে। ক্রেটগুলো গুরুত্ব অনুসারে নতুন করে সাজাল ওরা দু'জন, প্লেন ল্যান্ড করলে তাড়াহুড়ো করে লোড করা হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পাঁচটা মডেল প্রথমে তোলা হবে প্লেনে। তারপর ডেথ-মাস্ক আর টাইটার মূর্তি আছে যে ক্রেটে, সেটা। তৃতীয় দফায় তোলা হবে তিনটে মুকুট–লাল, সাদা আর নীল ক্রাউন। এই তিনটের দাম সম্ভবত বাকি সমস্ত ট্রেজারের চেয়েও বেশি। কাজটা শেষ করে আহত গেরিলাদের সঙ্গে কথা বলল রানা, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে। সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল আত্মত্যাগের জন্যে। ওদেরকে প্লেনে ওঠার প্রস্তাব দিল রানা, এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যায়। সুস্থ হবার পর আবার ওদেরকে ইথিওপিয়ায় পৌছেও দেয়া হবে। সব খরচ রানার। নগদ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার থেকে একটা পয়সাও কাটা হবে না।

আহতদের মধ্যে থেকে সাতজন ওর প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল, কমান্ডার শাফিকে ছেড়ে কোথাও তারা যাবে না। বাকি সবাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো, বিশেষ করে রুবির যুক্তি এড়াতে না পেরে। যারা প্লেনে উঠবে তাদেরকে এয়ারস্ট্রিপের আরও কাছাকাছি তুলে আনা হলো। ক্রেটগুলো আগেই সরিয়ে আনা হয়েছে।

'আপনি কি করবেন?' রুবিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনিও কি আমাদের সঙ্গে আসছেন? পুরোপুরি সুস্থ এখনও আপনাকে বলা যায় না।'

হেসে উঠল রুবি। 'যতক্ষণ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব, আপনারা আমাকে শাফির পাশেই দেখতে পাবেন।'

'আপনি কি জানেন, নিজের ভাগের শেয়ার শাফি আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'অতিরিক্ত বোঝা সঙ্গে নিতে রাজি নয়?'

'জানব না কেন। শাফি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। এখানে যুদ্ধ চালাতে হলে আমাদের টাকা দরকার।' নিজের অজান্তেই ঝট করে মাথাটা নিচু করে নিল রুবি, অকস্মাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটার পরপরই। ঝোপের কিনারা থেকে ধুলোর লম্বা একটা স্তম্ভ আকাশের দিকে খাড়া হলো। বাতাসে শিস কেটে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল শ্র্যাপনেল। 'সুইট মেরি! কি ওটা?' আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে রুবির চেহারা।

'দু'ইঞ্চি মর্টার,' বলল রানা। নড়েনি ও, আড়াল পাবারও চেষ্টা করেনি। 'যত গর্জে তত বর্ষে না। ঘুমা শেষবার 'কপ্টারে করে ওগুলো এনেছে বলে মনে হয়।'

'হারকিউলিস এখানে পৌঁছুচ্ছে কখন?'

'ইস্কান্দারকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি।' রেডিওর ওপর ঝুঁকল রানা।

নিমা আর রুবি পরস্পরের হাত ধরে ফিসফিস শুরু করল। রুবি বলল, 'আপনারা, বিদেশীরা, এত নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা থাকেন কিভাবে, ভাই?'

'আমি আর রানা এক দেশের মানুষ নই,' জবাব দিল নিমা। 'রানা বাংলাদেশী, আর আমি মিশরীয়। আমাদের ধর্মও মেলে না।' বিষণ্ন আর অন্যমনস্ক দেখাল ওকে। তবে এক সেকেন্ড পরই আবার হাসল। 'আপনাকে একটা কথা বলি, ভাই। আমার জীবনের ট্র্যাজেডি কি জানেন? যাকেই খুব বেশি ভাল লাগে, তাকেই আমার হারাতে হয়।'

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?' রুবির মুখ শুকিয়ে গেল।

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি,' জবাব দিল নিমা। 'হাসলান চাচা ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁকে হারিয়েছে। তার আগে পরম বন্ধু ছিলেন আমার বাবা, তিনিও অকালে মারা গেলেন। তারপর পরিচয় হলো রানার সঙ্গে, আপনার সঙ্গে, শাফির সঙ্গে। আপনাদের সবাইকে আমার হারাতে হবে, আমি জানি। আপনারা সবাই মারা যাবেন, সে-কথা বলছি না। বলতে চাইছি, সম্পর্কটা ধরে রাখতে পারব না।'

'কিন্তু কেন?' রুবি বিস্মিত। 'আবার আমাদের দেখা হতে পারে না?'

'আপনার সঙ্গে হয়তো দেখা হতে পারে, আপনি যদি কোনদিন মিশরে যান, কিংবা আমি যদি আবার কোন দিন ইথিওপিয়ায় আসি। কিন্তু রানার সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?' রুবির কাছে এখনও ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে।

'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়,' এড়িয়ে যেতে চাইছে নিমা। 'শুধু জানি, রানাকে আমি চিরকালের জন্যে হারাব।'

'আপনাদের বিয়ে হতে পারে না,' বলল রুবি। 'বাধাটা সম্ভবত ধর্ম। তবে

আমি যদি বলি, মাসুদ ভাইকে আপনি ভালবেসে ফেলেছেন, সেটা কি ভুল বলা হবে?'

'আপনি খুব বুদ্ধিমতী, রুবি।' ম্লান হাসি ফুটল নিমার ঠোঁটে। 'সব জেনে ফেলেন।'

মাইক্রোফোনে কথা বলছে রানা, 'ইস্কান্দার, দিস ইজ রানা। আপনার পজিশন জানান।'

'স্যার, আমরা বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাব। আপনারা কি চিনে বাদাম ভাজছেন, নাকি আমি মর্টারের আওয়াজ শুনছি?'

'এত যার রসবোধ, তার মঞ্চে থাকা উচিত ছিল,' বলল রানা। 'শত্রুরা এয়ারস্ট্রিপের দক্ষিণ প্রান্ত দখল করে নিয়েছে। আপনাকে উত্তর দিক থেকে আসতে হবে। বাতাস বইছে পশ্চিম দিক থেকে, গতি পাঁচ নট।'

'ধন্যবাদ, স্যার। প্যাসেঞ্জার আর কার্গো সম্পর্কে বলুন।'

'প্যাসেঞ্জার ছয় আর তিন নয়জন। ক্রেটের সংখ্যা বাহান্ন, প্রায় দেড় টন ওজন।'

'এত কম লোক আর কার্গোর জন্যে আসতে বলেছেন আমাকে?' ইস্কান্দার হেসে উঠল।

'টাইটা, সাবধান! এলাকায় আরেকটা এয়ারক্রাফট আছে। জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। সবুজ আর লাল। মতিগতি সুবিধের নয়, তবে আন আর্মড।'

'রজার, ফারাও। শেষ একবার যোগাযোগ করব।'

রেডিও ছেড়ে আহত গেরিলাদের কাছে চলে এল রানা, এখানে নিমা আর রুবিও রয়েছে। 'প্লেন আসতে আর বেশি দেরি নেই,' গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। 'শুধু এক কাপ চা খাওয়ার সময় আছে।'

বলতে হলো না, নিজেই চা বানাতে বসে গেল মারটিন।

হাতে চায়ের কাপ, নিমা হঠাৎ বলল, 'আপনার হারকিউলিস পৌঁছে গেছে, এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি আমি।'

রানা কান পাতল। 'বোধহয় তাই।' রেডিওর কাছে চলে এল ও, মাইক্রোফোন তুলে কথা বলল ইস্কান্দারের সঙ্গে।

'পাঁচ মিনিট পর ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, স্যার,' জবাব দিল ইস্কান্দার।

লম্বা এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাকাল রানা। শাফির গেরিলারা পিছু হটছে এখনও, কাঁটাঝোপের ভেতর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, পিছু হটার সময়ও অনবরত গুলি করছে তারা। কর্নেল ঘুমা খুব জোরে তাড়া করেছে। 'তাড়াতাড়ি, ইস্কান্দার, তাড়াতাড়ি,' বিড়বিড় করছে রানা। তবে নিমা আর রুবির দিকে ফেরার আগে চেহারায় হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'কাপে আস্তে ধীরে চুমুক দিন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

গোলাগুলির চেয়ে প্লেনের আওয়াজ বেড়ে গেছে। তারপর হঠাৎ ওটাকে দেখা গেল। এত নিচু দিয়ে আসছে, মনে হলো কাঁটাগাছগুলোয় ঘষা খাবে। দুই ডানা এত বড়, আগাছায় চাপা পড়ে সরু হয়ে থাকা এয়ারস্ট্রিপের দুই প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করছে। জমিন স্পর্শ করল প্লেন, ধুলোর মেঘ পাক খেতে শুরু করল পিছনে,

এঞ্জিন রিভার্স করে দিল পাইলট।

ঝোপগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল হারকিউলিস, ককপিট থেকে ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল ইস্কান্দার। স্পীড যথেষ্ট কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুটব্রেক আর রাডার বার-এর ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ঘুরে যাচ্ছে প্লেন, স্ট্রিপ ধরে ফিরে আসছে ওদের দিকে, কাছাকাছি আসার আগেই লোডিং র‍্যাম্প খুলে গেল।

খোলা হ্যাচওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালান্দার, ইস্কান্দারের ছেলে। লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, আহত লোকগুলোকে স্ট্রেচারে তুলতে সাহায্য করল রানা আর মারটিনকে। র‍্যাম্প বেয়ে ওদেরকে তুলতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। তার পরই শুরু হয়ে গেল অ্যামুনিশন ক্রেট লোড করার কাজ। ওদের সঙ্গে নিমাও হাত লাগাল কাজে, হালকা ক্রেটগুলো একাই বয়ে নিয়ে এল। একটা ক্রেটও ফেলে যেতে রাজি নয় ও।

দাঁড়ানো হারকিউলিসের দেড় শো গজ দূরে বিস্ফোরিত হলো একটা মর্টার। দ্বিতীয় শেলটা পড়ল মাত্র একশো গজ দূরে।

ক্রেট কাঁধে ছুটছে রানা, চিৎকার করে বলল, 'রেঞ্জিং শট!'

'ওরা আমাদেরকে সাইটে পেয়ে গেছে,' কালান্দারও চেঁচাচ্ছে। 'এখুনি কেটে পড়তে হয়। বাকি কার্গো তোলার সময় নেই। লেট'স গো! গো··· গো··· গো···!'

আর মাত্র চারটে ক্রেট ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে। কালান্দারের তাগাদায় কান না দিয়ে মারটিন আর রানা র‍্যাম্প বেয়ে ছুটল। ঝোপের ভেতর ঢুকে দুটো করে বাক্স মাথায় তুলল ওরা, ছুটে ফিরে আসছে আবার। র‍্যাম্প ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে, প্লেনের এঞ্জিন গর্জে উঠল, গড়াতে শুরু করেছে চাকা। টেইলবোর্ডের ওপর দিয়ে ক্রেটগুলো ছুঁড়ে দিল ওরা, তারপর লাফিয়ে ধরে ফেলল দরজার কিনারা। প্লেনের ভেতর ঢুকে মারটিনকে টেনে নিল রানা।

আবার যখন পিছনে তাকাল ও, ঝোপের পাশে নিঃসঙ্গ আর একা লাগল রুবিকে। 'শাফিকে আমার ধন্যবাদ আর শুভেচ্ছা জানাবেন!' চিৎকার করে বলল ও।

রুবিও চিৎকার করল, 'আমাদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে আপনি জানেন।'

'গুডবাই, রুবি,' নিমার চিৎকার এঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেল, ধুলোর সচল মেঘে ঢাকাও পড়ে গেল রুবি। হিসহিস শব্দ তুলে পুরোপুরি উঠে এল র‍্যাম্প।

নিমার কাঁধে হাত রেখে বিশাল গুহার মত কার্গো হোল্ড হয়ে ককপিটের কাছাকাছি একটা জাম্প সীটের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। নিমাকে সীটে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'স্ট্র্যাপ বাঁধুন।' তারপর ছুটল ককপিটের দিকে।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছিল আপনি বোধহয় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' হেসে উঠে রানাকে বলল ইস্কান্দার, কন্ট্রোল থেকে চোখ না তুলেই। 'শক্ত হোন! আকাশে ডানা মেলছি!'

পাইলটের সীটের পিছনটা আঁকড়ে ধরল রানা, ইস্কান্দার আর কালান্দার

কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। থ্রটল লিভার ঠেলে দিয়ে ফুল পাওয়ার দিল ওরা, প্লেনের গতি ক্রমশ বাড়ছে।

ইস্কান্দারের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল রানা, রানওয়ের শেষ মাথায় ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া আকৃতি দেখা যাচ্ছে। ওদিকেই ছুটছে প্লেন, ঝোপের ভেতর থেকে সৈনিকরা গুলি করছে এদিকে।

'এ-সব খুদে বুলেটে আমার হারকিউলিসের তেমন কোন ক্ষতি হবে না,' ইস্কান্দার বলল। 'হারকিউলিস খুব শক্ত বুড়ি।' তারপর প্লেনটাকে আকাশে তুলে ফেলল সে।

জমিনে ছড়িয়ে থাকা সরকারী সৈন্যদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এল প্লেন, আকাশের দিকে নাক উঁচু করে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। 'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড, ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড। বাপ-বেটা, ইস্কান্দার ও কালান্দারের ওপর ভরসা রাখার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' তারপর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড পর বেলুনের মত চুপসে গেল ইস্কান্দার, প্রায় কাতরে উঠে, বলল, 'কি যন্ত্রণা! ওই ফড়িং আবার কোত্থেকে এল?'

নীলনদের পাড় ঘেঁষা ঝোপ থেকে সরাসরি প্লেনের সামনে আকাশে উঠে আসছে প্রক্সি কোম্পানীর জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টার। এমন তির্যক একটা কোণ ধরে ওপরে উঠছে ওটা, বোঝাই যায় যে দ্রুতগতি হারকিউলিস এখনও পাইলটের দৃষ্টি পথের বাইরে রয়েছে, তা না হলে প্লেনের পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করত।

'মাত্র পাঁচশো ফুট ওপরে উঠেছি আমরা, স্পীড একশো দশ নট,' ডান দিকের সীট থেকে চিৎকার করে বাপকে সাবধান করল কালান্দার। 'এই অবস্থায় দিক বদল সম্ভব নয়।'

জেট রেঞ্জার এত কাছে যে ফ্রন্ট সীটে বসা কর্নেল ঘুমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা, তার চশমায় লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। পাইলটের আগে সেই প্রথম হারকিউলিসকে দেখতে পেল। রানা তার চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠতে দেখল। সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে কপ্টারটাকে ঘুড়ির মত গোত্তা খাওয়াতে চেষ্টা করল পাইলট, বিশাল হারকিউলিসের পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টায়। সংঘর্ষ এড়ানো অসম্ভব বলে মনে হলো, তবে দক্ষতার সঙ্গেই 'কপ্টারটাকে পাক খাওয়াতে শুরু করল সে, ডিগবাজি খাওয়ানোর ভঙ্গিতে হারকিউলিসের পেটের নিচে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা, প্লেনের আরোহীরা অনুভব করল দুটো আকাশযানের ফিউজিলাজ পরস্পরকে আলতো চুমো খেলো।

ছোঁয়াটুকু যতই সামান্য হোক, 'কপ্টারের নাক জমিনের দিকে ঘুরে গেল, সেটা মাত্র চারশো ফুট নিচে। হারকিউলিস ফুল স্পীডে ছুটছে, ওপরে উঠছে ক্রমশ, কিন্তু হেলিকপ্টারের পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। 'কপ্টার যখন জমিন থেকে দুশো ফুট ওপরে, হারকিউলিস টার্বো-প্রপ এঞ্জিনগুলো, প্রতিটি চার হাজার নয়শো হর্সপাওয়ার, বাতাসে তীব্র আলোড়ন তুলল, সেই আলোড়ন প্রচণ্ড পাথরধসের মত আঘাত করল ওটাকে।

বাতাসে ভেসে থাকা ঝরা পাতার মত লাগছে এখন। 'কন্টারটাকে, ডিগবাজি খাচ্ছে বিরতিহীন। এঞ্জিন ফুল পাওয়ারে চালু, জমিনের ওপর পড়ল সেটা। ফিউজিলাজ অ্যালুমিনিয়াম ফুয়েলের মত দুমড়ে মুচড়ে গেল, কর্নেল ঘুমা মারা গেল এমন কি ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হবার আগেই। আগুনের বিশাল একটা কুণ্ডলী গ্রাস করল জেট রেঞ্জারকে।

উত্তরের কোর্স ধরে ছুটছে হারকিউলিস। নিচে সুদান। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেইন কেবিনে ফিরে এল রানা।

'আহতদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা যাক,' মারটিনকে বলল ও। মারটিনের সঙ্গে নিমাও সেফটি বেল্ট খুলে হাত লাগাল কাজে। তড়াহুড়োর মধ্যে স্ট্রেচারগুলো প্লেনের দরজার কাছাকাছি রাখা হয়েছিল, সেগুলো সরিয়ে আরও ভেতর দিকে আনা হলো। ইস্কান্দার কিছু ওষুধ-পত্র নিয়ে এসেছে, সঙ্গে অল্প কিছু খাবারও, সে-সব বিলি-বন্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। খানিক পর নিমা আর মারটিনকে ওখানে রেখে ফ্লাইট-ডেকের পিছনে, গ্যালিতে চলে এল রানা। ফ্রিজ খুলে টিনের কৌটা থেকে সুপ আর তাজা পাউরুটি বের করল ও, চুলোয় আগেই চায়ের পানি চড়িয়েছে।

চায়ের পানি ফুটছে, নিজের ইমার্জেন্সী প্যাক থেকে একটা নাইলন ওয়ালেট বের করল রানা, ভেতরে কিছু ওষুধ-পত্র আছে। একটা শিশি থেকে পাঁচটা ট্যাবলেট বের করল, গুঁড়ো করে ফেলে দিল দুটো মগে। মগ দুটোয় চা ঢেলে চিনি আর দুধ মেশাল, ভাল করে নাড়ল চামচ দিয়ে। আরব দেশের মেয়ে, গরম এক মগ চায়ের লোভ সামলাতে পারবে না।

আহত গেরিলাদের খাওয়ানো হয়ে গেছে, গ্যালি থেকে ফিরে এসে মারটিন আর নিমাকে মাখন লাগানো রুটি আর সুপ খেতে দিল রানা, সঙ্গে মগ ভর্তি চা। ওরা দু'জন চা খাচ্ছে, ফ্লাইট ডেকে ফিরে এল রানা, হেলান দিল ইস্কান্দারের সীটের পিঠে। 'মিশরীয় সীমান্তে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?' জানতে চাইল ও।

'চার ঘণ্টা বিশ মিনিট,' বলল ইস্কান্দার।

'মিশরীয় এয়ার স্পেস এড়িয়ে যাবার কোন উপায় আছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

সীটে ঘুরে গিয়ে রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ইস্কান্দার। 'লিবিয়ার ওপর দিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তবে গাদ্দাফীর এয়ারফোর্স বিনা নোটিশে গুলি করে ফেলে দিলে কিছু করার নেই। আরও সমস্যা আছে। ওদিকে গেলে সাত ঘণ্টা বেশি থাকতে হবে আকাশে, ফুয়েলে কুলাবে না-সাহারার কোথাও ফোর্স ল্যান্ডিং করতে হবে।' একটা ভুরু কপালে তুলল সে। 'কি ব্যাপার, মি. রানা, এ-ধরনের প্রশ্ন করার অর্থ কি?'

'কোন অর্থ নেই, হঠাৎ উঁকি দিল মনে,' বলল রানা।

'এ-ধরনের প্রশ্ন আমাকে ঘাবড়ে দেয়,' জোর করে হাসল ইস্কান্দার।

তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'ভুলে যান।'

মেইন হোল্ডে ফিরে এসে রানা দেখল দুটো ফোল্ড-ডাউন বাঙ্কে বসে রয়েছে নিমা ও মারটিন। নিমার খালি মগটা ওর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। পাশে বসল রানা, একটা হাত তুলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নিমা। 'ভাগ্য ভাল যে আপনার মাথার ক্ষতটা প্রায় শুকিয়ে গেছে,' ফিসফিস করে বলল রানাকে।

প্রথমে ঘুমিয়ে পড়ল মারটিন। শুয়ে পড়ল সে, চোখ বুজল, খানিক পরই নাক ডাকতে শুরু করল। কয়েক মিনিট পর রানার গায়ে ঢলে পড়ল নিমা, সাবধানে ওর পা দুটো বাঙ্কের ওপর তুলে ভাল করে শুইয়ে দিল রানা, একটা চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দিল। তারপর ঝুঁকে আলতো একটা চুমো খেলো নিমার কপালে। 'যাই তুমি করে থাকো, তোমাকে কিভাবে আমি ঘৃণা করতে পারি!'

ল্যাভেটোরিতে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রানা। হাতে প্রচুর সময় আছে। অন্তত তিন-চার ঘণ্টার আগে নিমা আর মারটিনের ঘুম ভাঙবে না। আর ইস্কান্দার ও কালান্দারকে ককপিটে ব্যস্ত থাকতে হবে সারাক্ষণ, প্লেনের কোথায় কি ঘটছে জানার সুযোগ হবে না ওদের।

কাজটা শেষ হতে হাতঘড়ি দেখল রানা। দু'ঘণ্টা লেগেছে। টয়লেট সীট বন্ধ করে হাত ধুলো ও। খুদে কেবিনে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দরজার তালা খুলল।

ফোল্ড-ডাউন বাঙ্কে এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে নিমা আর মারটিন। মেইন হোল্ড থেকে আবার ফ্লাইট-ডেকে চলে এল রানা। কান থেকে এয়ারফোন খুলে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল কালান্দার। 'সামনে নীলনদ।'

তার বাপের সীটের ওপর ঝুঁকে রানা জানতে চাইল, 'ঠিক কোথায় রয়েছি আমরা?'

উরুর ওপর মেলা চার্টটায় মোটা তর্জনী রাখল ইস্কান্দার। 'এখানে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে মিশরীয় সীমান্তে পৌঁছে যাব।'

'তার আগে, এখুনি,' এমন ভারী সুরে শুরু করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো ইস্কান্দার, 'রেডিওতে কথা বলব আমি আবু সিমবেল এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে।'

'সে তো আমি বলব,' প্রতিবাদের সুরে বলল ইস্কান্দার। 'পাইলট হিসেবে আমারই তো ওদেরকে জানাবার কথা যে আমরা আসছি, ল্যান্ড করার অনুমতি দাও।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কথা আছে,' বলল ও। 'কন্ট্রোল টাওয়ারকে আপনি ডাকুন, অনুমতি চান, কিন্তু তারপর মাইক্রোফোনটা আমাকে দিতে হবে।'

'কেন?'

'আমি ওদের মাধ্যমে মিশরীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।'

আবার একই প্রশ্ন করল ইস্কান্দার। 'কেন?'

রেগে গেল রানা। 'সব কথা ব্যাখ্যা করার সময় নেই। কেন, নিজেই জানতে পারবেন, শুধু একটু ধৈর্য ধরুন।'

রানার রাগ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ইস্কান্দার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনিই বস্।'

'রেঞ্জের মধ্যে এসেছে আবু সিমবেল?' জানতে চাইল রানা।

জবাব না দিয়ে রেডিও সেট অন করল ইস্কান্দার, মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে মাউথপীসে কথা বলছে, 'হ্যালো, আবু সিমবেল। দিস ইজ জুলু হুইস্কি ইউনিফর্ম ফাইভ জিরো জিরো।'

তৃতীয়বার ডাকার পর আবু সিমবেল কন্ট্রোল সাড়া দিল। রুটিন অনুসারে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল ইস্কান্দার। পাঁচ মিনিট পর আবু সিমবেল কন্ট্রোল টাওয়ার উত্তরে গতি বজায় রাখার অনুমতি দিল তাকে। ইস্কান্দার এরপর টাওয়ারকে জানাল, 'আরোহীদের মধ্যে একজন ভিআইপি আছেন। এখন তিনি একটা মেসেজ দেবেন।' কাঁধের ওপর দিয়ে মাইক্রোফোনটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একটা কাগজে চোখ বুলাল রানা, আগেই লিখে রেখেছে। তারপর শান্ত সুরে বলল, 'আমি বাংলাদেশের নাগরিক, মাসুদ রানা। আমি যে মেসেজটা পড়ব সেটা ফোন বা ফ্যাক্স যোগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিশরের প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি পৌঁছুতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট আমাকে চেনেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কয়েকবার আমার আলাপ হয়েছে, কাজেই নাম বললেই আমাকে উনি চিনবেন। আবার বলছি, মেসেজটা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সরাসরি আপনাদের প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুতে হবে।'

'হোয়াট ইজ দিস?' টাওয়ার থেকে বিরক্তি প্রকাশ করা হলো। 'এরকম ঠাট্টা করার মানে কি?'

'দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী কল,' বলল রানা। 'ঠাট্টা নয়। আই রিপিট, দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী কল। আমার মেসেজ প্রেসিডেন্টের কানে না পৌঁছুলে, বা পৌঁছুতে দেরি হলে, মিশরের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর তার জন্যে দায়ী হবেন আপনারা।'

টাওয়ার কর্তৃপক্ষ এবার ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিল। 'ঠিক আছে, মেসেজটা কি বলুন।'

ঝাড়া তিন মিনিট মাইক্রোফোনে কথা বলল রানা। কথাগুলো শুনে ছানাবড়া হয়ে গেল ইস্কান্দার আর কালান্দারের চোখ। তবে তারা কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

নয়

আরও এক ঘণ্টা বিশ মিনিট নির্বিঘ্নে উড়ল ওরা, তবে প্রতি মিনিটে স্নায়ুর ওপর চাপ আরও বাড়ছে রানার।

অকস্মাৎ, কোন রকম আভাস না দিয়ে, একটা ফাইটার ইন্টারসেপটরের রূপালি ঝলক দেখা গেল সরাসরি সামনে। ওদের নিচ থেকে উঠে এল সেটা,

হারকিউলিসের বো-র সামনে। রাগে ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ইস্কান্দার, পরমুহূর্তে দেখল রকেট বেগে আরও দুটো ফাইটার ওদের প্লেনের নিচ থেকে উঠে আসছে, এত কাছে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

সবাই ওরা ফাইটার প্লেনগুলোর টাইপ চিনতে পারল। মিগ টোয়েনটি ওয়ান, মিশরীয় এয়ারফোর্সের মূল শক্তি। ডানার নিচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, পড থেকে ঝুলছে।

'আনআইডেনটিফায়েড এয়ারক্রাফট!' মাউথপীসে চিৎকার করছে ইস্কান্দার। 'স্টেট ইওর কল সাইন!'

ইতিমধ্যে দুটো ফাইটার হারকিউলিসের দু'পাশে চলে এসেছে, অপরটা উঠে এসেছে ওদের মাথার ওপর আকাশে।

জবাব এল, 'জেড-ডব্লিউ-ইউ ফাইভহানড্রেড, দিস ইজ রেড লীডার অভ দা ইজিপশিয়ান পিপল'স এয়ার ফোর্স। ইউ উইল কনফার্ম টু মাই অর্ডারস।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ইস্কান্দার। 'কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। আপনার মেসেজ পাঠানোর ফল নয় তো?'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'ঠিক কি ঘটছে আমিও বুঝতে পারছি না।'

'রেড লীডার যা বলছে শোনো, ড্যাড,' বাপকে পরামর্শ দিল কালান্দার। 'তা না হলে মিসাইল ছুঁড়ে উড়িয়ে দেবে আমাদের।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ইস্কান্দার, তারপর মাইক্রোফোনে বলল, 'দিস ইজ জেডডব্লিউইউ ফাইভহানড্রেড। আমরা সহযোগিতা করব। প্লীজ আপনাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।'

'আপনার নতুন হেডিং জিরোফাইভথ্রী। নির্দেশ এখুনি পালন করুন।'

প্লেনটাকে পুব দিকে ঘুরিয়ে নিল ইস্কান্দার, তারপর চার্টের দিকে তাকাল। 'আসওয়ান!' সবিস্ময়ে বলল। 'ওরা আমাদেরকে আসওয়ানে পাঠাচ্ছে! তাহলে তো এখুনি আসওয়ানকে জানাতে হয় যে আমাদের সঙ্গে আহত লোকজন আছে।'

মেইন হোল্ডে ফিরে এসে নিমার ঘুম ভাঙাল রানা, লক্ষ করল ল্যাভেটোরির দিকে যাবার সময় সামান্য একটু টলছে। তবে দশ মিনিট পর যখন ফিরে এল, পুরোপুরি তাজা ও সচেতন দেখাল ওকে, মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়েছে।

ওদের সামনে এখন আবার নীলনদকে দেখা যাচ্ছে, দুই পাড়েই ছড়িয়ে পড়েছে আসওয়ান শহর। আসওয়ানের কন্ট্রোল টাওয়ার নির্দেশ দিতে ল্যান্ড করার জন্যে রানওয়ে বরাবর সিধে হলো হারকিউলিস। মরুভূমি থেকে ওদেরকে পথ দেখিয়ে এদিকে এনেছে মিশরীয় এয়ারফোর্সের ফাইটারগুলো, এখন আর ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবে টাওয়ারের সঙ্গে তাদের রেড লীডারের কথাবার্তা শোনা গেল। বন্দী হারকিউলিসকে আসওয়ান টাওয়ারের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে তিন ফাইটারের বহরটা।

পেরিমিটার বেড়া পেরিয়ে এসে রানওয়েতে ল্যান্ড করল হারকিউলিস। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে নির্দেশ এল, 'টার্ন ফার্স্ট ট্যাক্সি-ওয়ে রাইট।' মেইন রানওয়ে থেকে বাঁক ঘুরতেই সামনে ছোট একটা ভেহিকেল দেখা গেল, ছাদের

সাইনবোর্ডে লেখা, ইংরেজি ও আরবীতে, 'আমাকে অনুসরণ করুন।'

ভেহিকেলটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা হ্যাঙ্গারের সামনে নিয়ে এল। প্লেন স্থির হতেই হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটনী পাঁচটা ট্রাক, দ্রুত এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলল হারকিউলিসকে, সাদা কাপড় পরা সশস্ত্র কিছু লোক লাফ দিয়ে নিচে নামল, হাতের অটোমেটিক রাইফেল প্লেনের দিকে তাক করা।

টাওয়ারের নির্দেশ পেয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল ইস্কান্দার। 'কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি পারছেন, স্যার?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা, খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে আবার নির্দেশ এল। টেইল র‍্যাম্প নামাতে বলছে।

ককপিটে ওরা কেউ কথা বলছে না, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, চেহারায় বিস্ময় ও উদ্বেগ।

হঠাৎ পেরিমিটার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল সাদা একটা ক্যাডিলাক, সরাসরি ছুটে এসে হারকিউলিসের কার্গো র‍্যাম্পের সামনে ব্রেক কষল। লাফ দিয়ে নিচে নেমে দরজা খুলল শোফার, শেষ বিকেলে রোদে বেরিয়ে এলেন বিশাল বপু আরোহী। চেহারায় বলে দেয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিজাত মানুষ, ধীর-স্থির ও দৃঢ়চেতা। হালকা রঙের ট্রপিক্যাল সুট পরে আছেন, জুতো জোড়া সাদা, মাথায় পানামা হ্যাট, চোখে গাঢ় চশমা। র‍্যাম্প বেয়ে প্লেনে চড়ছেন তিনি, সঙ্গে দু'জন পুরুষ সেক্রেটারি।

প্লেনের ভেতর ওরা পাঁচজন অপেক্ষা করছে।

কর্তা ব্যক্তি চোখ থেকে গাঢ় চশমা খুলে ব্রেস্ট পকেটে গুঁজলেন। নিমাকে চিনতে পেরে হ্যাটটা মাথা থেকে খুলে হাসলেন। 'আল নিমা! আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন! কংগ্রাচুলেশন্স।' নিমার হাতটা ধরে ঝাঁকালেন, রানার দিকে তাকাবার সময়ও সেটা ছাড়লেন না।

'আপনি নিশ্চয়ই মি. মাসুদ রানা। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি। আল নিমা, আপনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না?'

কথা বলার সময় রানার সরু চোখের দিকে তাকাতে পারল না নিমা, 'উনি আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিম।'

'সত্যি কথা বলতে কি,' রানার গলায় ক্ষীণ ব্যঙ্গ, 'আমিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অপ্রত্যাশিত উল্লাস অনুভব করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।'

'আমাদের প্রাচীন ও গৌরবময় অতীত ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া বিপুল প্রত্ন সম্পদ মিশরে ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকার ও মিশরীয় জনগণের তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা।' সাজিয়ে রাখা অ্যামুনিশন ক্রেটগুলোর দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিম।

'প্লীজ, এটাকে খুব বড় করে দেখবেন না,' বলল রানা, তবে নিমার ওপর থেকে পলকের জন্যেও চোখ সরাতে পারছে না। যদিও নিমা ওর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

'কি যে বলেন, স্যার,' মন্ত্রী আবু কাসিম অমায়িক হাসি হাসলেন। 'এই

অভিযানে আপনার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, সে-ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই আমরা চাই না আপনি খালি পকেটে ফিরে যান। ড. নিমা আমাকে জানিয়েছেন, আপনার পকেট থেকে প্রায় আড়াই লাখ স্টার্লিং বেরিয়ে গেছে।' কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এতে সুইস ব্যাংকের একটা চেক আছে, দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের। চেকটা নিয়ে আপনি আমাদেরকে ঋণমুক্ত করুন, মি. রানা, প্লীজ।'

'আপনি সত্যি খুব উদার মানুষ, মিনিস্টার,' এনভেলাপটা পকেটে ভরার সময় বলল রানা, ভাব দেখে মনে হলো হাসি চেপে রেখেছে। 'এটাও বোধহয় ড. আল নিমার পরামর্শ?'

'অবশ্যই,' সহাস্যে বললেন আবু কাসিম। 'আপনার সম্পর্কে ড. নিমার খুব উঁচু ধারণা...'

'তাই কি?' বিড়বিড় করল রানা, এখনও নিমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন আবু কাসিম। 'আহত লোকজনকে একটা ট্রাকে তোলা যেতে পারে।' পিছন ফিরে কাকে যেন ইঙ্গিত দিলেন তিনি, প্লেনের ভেতর সশস্ত্র লোকজন ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন লোক পাহারায় থাকল, বাকি দশ-বারোজন হাত লাগাল ক্রেটগুলো নামানোর কাজে।

দশ মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল হারকিউলিস। বাহান্নটা ক্রেট চারটে পাঁচ টনী ট্রাকে তোলা হলো, ট্রাকগুলো ঢেকে দেয়া হলো তারপুলিন দিয়ে। সময় নষ্ট না করে কনভয়টা রওনা হয়ে গেল তখুনি। বাকি একটা ট্রাকে আহত গেরিলাদের তোলা হয়েছে, তবে এখনও সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

'বিদায়, মি. রানা,' মিটিমিটি হেসে রানার দিকে ডান হাতটা বাড়ালেন আবু কাসিম। 'আবু সিমবেল থেকে এদিকে সরিয়ে আনার জন্যে সত্যি দুঃখিত। তবে কি জানেন, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি জানি, নিজের পথে রওনা হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছেন আপনি। কাজেই আপনাকে আর আটকে রাখব না। বিদায়ের আগে আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি আমি? আপনাদের সঙ্গে যথেষ্ট ফুয়েল আছে তো?'

ইস্কান্দারের দিকে তাকাল রানা, ইস্কান্দার তিক্ত সুরে বলল, 'আছে।'

'গুড! গুড!' কোন কারণ নেই, তবু উল্লসিত দেখাচ্ছে আবু কাসিমকে।

'একটা প্রশ্ন, মাননীয় মন্ত্রী,' বলল রানা, সুরটা প্রায় কঠিনই। 'ফারাও মামোসের এই গুপ্তধন আপনি সম্ভবত নতুন কোন ভবনে রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই না? আমি বলতে চাইছি, পুরানো কোন মিউজিয়ামে তো ওগুলোর জায়গা হবে না, কি বলেন?'

হতচকিত দেখাল মন্ত্রী মহোদয়কে। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসলেন তিনি। 'আশ্চর্য! আপনি জানলেন কিভাবে? ঠিক তাই, মি. রানা, নতুন একটা ভবনে তোলা হবে সব, নতুন একটা মিউজিয়ামে...'

'কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সবই কায়রো মিউজিয়ামে রাখা

হবে,' অবাক হয়ে বলল নিমা।

'কিছু কিছু, কিছু কিছু,' তাড়াতাড়ি বললেন আবু কাসিম। 'বাছাই করার পর। এ-সব বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হবে আপনার সঙ্গে আমার। ওহ-হো, আসল কথাটাই তো আপনাকে বলা হয়নি, ড. আল নিমা!' কপালে হালকা চাটি মারলেন মন্ত্রী মহোদয়। 'আপনাকে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যান্টিকুইটিজ-এর নতুন ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। কংগ্রাচুলেশন্স, আল নিমা। আপাতত গোপন জায়গায় তোলা হচ্ছে ফারাও মামোসের গুপ্তধন, তবে শেষ পর্যন্ত কোথায় রাখা হবে না হবে সে-ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।'

ঢিল পড়ল নিমার পেশীতে, হেসে উঠে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন,' বলে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করলেন আবু কাসিম।

নিমা তাঁকে অনুসরণ করতে যাবে, পিছন থেকে নরম সুরে ডাক দিল রানা, 'নিমা।'

পাথর হয়ে গেল নিমা। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে রানার দিকে ঘুরল, ওরা ল্যান্ড করার পর এই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকাল।

'এ আমার পাওনা ছিল না,' বলল রানা, আর তারপরই আবেগের একটা ধাক্কা খেয়ে উপলব্ধি করল নিঃশব্দে কাঁদছে নিমা। ওর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে, চোখের পানি গড়াচ্ছে গাল বেয়ে।

'আমি দুঃখিত, রানা,' ফিসফিস করে বলল নিমা। 'কিন্তু আপনার জানার কথা যে আমি চোর নই। মামোসের গুপ্তধন মিশরের প্রাপ্য, আমাদের নয়।'

'তাহলে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, সেটা মিথ্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চুক্তির কথাটা নাহয় আমি বাদই দিলাম।'

'না!' বলল নিমা। 'আমি...' ভাষা হারিয়ে ফেলে থরথর করে কেঁপে উঠল নিমা, ঝট করে ঘুরে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে নেমে গেল র‍্যাম্প বেয়ে। ওখানে, রোদের মধ্যে, ক্যাডিলাকের দরজা খুলে অপেক্ষা করছে শোফার। মন্ত্রী আবু কাসিম আগেই গাড়িতে উঠে পড়েছেন। বাকি ট্রাকটায়ও সশস্ত্র লোকগুলো উঠে পড়ছে।

নিমাও গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, এই সময় যেন আকাশ ফুঁড়ে তিনটে সামরিক হেলিকপ্টার ছুটে এল ওদের দিকে। রোটরের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল সবাই। গাড়িতে উঠতে গিয়েও উঠল না নিমা, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কি ঘটছে দেখার জন্যে ক্যাডিলাক থেকে নেমে এলেন আবু কাসিম।

ক্যাডিলাকের তিন দিকে নামল 'কপ্টারগুলো। ইউনিফর্ম পরা মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা লাফ দিয়ে পড়ল টারমাকে। প্রতিটি 'কপ্টার থেকে নামলেন একজন করে সুট পরা বেসামরিক কর্মকর্তা–তিনজনই তাঁরা মন্ত্রী। সৈন্যরা এগিয়ে এল ক্যাডিলাকের দিকে। প্রথমেই ট্রাকে উঠে পড়া সশস্ত্র গার্ডদের নিরস্ত্র করা হলো। তারপর তিন মন্ত্রী মহোদয় এগিয়ে এলেন হারকিউলিসের দিকে। র‍্যাম্প বেয়ে উঠে সরাসরি রানার সামনে থামলেন তাঁরা।

ওদিকে, নিচে, একজন কর্নেল কথা বলছেন কালচারাল মিনিস্টার আতাহার

আবু কাসিমের সঙ্গে। রানা সহ সদ্য আগত তিন মন্ত্রীও সেদিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলের ভারী গলা এখান থেকেও শুনতে পাচ্ছে সবাই।

'মি. কাসিম, স্যার, আপনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আপনাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন,' বললেন কর্নেল। 'আপনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যান্টিকুইটিজ-এর ডিরেক্টর আল হাসলানকে খুন করার সঙ্গে আপনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে পালাবার সময় দু'জন খুনী আহত হয়, মারা যাবার আগে তারা আপনার আর আপনার আত্মীয় কারিফ ফারুকীর নাম বলে গেছে। আপনার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ, ড. আল নিমাকে ভুল বুঝিয়ে ফারাও মামোসের উদ্ধার করা গুপ্তধন আপনি সরকারী মিউজিয়ামে জমা দেয়ার ব্যবস্থা না করে নিজের গোপন আস্তানায় সরিয়ে ফেলার পাকা বন্দোবস্ত করেছেন। চারটে ট্রাক আটক করা হয়েছে, ড্রাইভার আর সশস্ত্র গার্ডরা আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ স্বীকার করেছে। আপনাকে আমার আরও জানানো দরকার যে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাধারণ কোন কোর্টে নয়, আপনার বিচার করা হবে সামরিক ট্রাইবুনালে।'

হাতকড়া পরানো হলো আতাহার আবু কাসিমকে। কারও দিকে তাকালেন না তিনি, কোন কথা বললেন না, মাথা নিচু করে সামরিক হেলিকপ্টারের দিকে এগোলেন।

একে একে নিজেদের পরিচয় দিলেন তিন মন্ত্রী, রানার সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন। তাদের মধ্যে পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও রয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, 'পৌঁছুতে কেন আমাদের দেরি হলো, আশা করি আপনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন, মি. মাসুদ রানা।' পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'মি. প্রেসিডেন্ট এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

এনভেলাপটা খুলে চিঠিটা পড়ল রানা। মিশরের প্রেসিডেন্ট অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তারপর অনুরোধ করেছেন রানা যেন তার দলবল নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে এক হপ্তা মিশরে থেকে যায়। তাঁর খুব ইচ্ছে রানার সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজ দেবেন। তারপর, শেষ লাইনে লিখেছেন, কোনও কারণে রানা যদি আপাতত তাঁর আতিথ্য গ্রহণে অপারগ হয়, আবার কবে মিশরে আসতে পারবে তা যেন জানিয়ে দিয়ে তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে।

'প্রেসিডেন্টকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন,' পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলল রানা। 'বলবেন, খুব শিগগির আবার মিশরে আসছি আমি। এই মুহূর্তে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে পারছি না, সেজন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত।'

কথা শেষ করে নিচে, নিমার দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হতে প্লেনের দিকে এক পা এগোল নিমা, তারপর কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে এল ওর।

রানা এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে তাকাল। 'ড. নিমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তো?' জানতে চাইল ও। 'উনি কিন্তু সরল মনেই আতাহার আবু কাসিমকে বিশ্বাস করেছিলেন।'

'না, না, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই,' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাড়াতাড়ি বললেন। 'অভিযোগ থাকলে কি আর তাঁকে আমরা ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর নির্বাচিত করি?'

'কথাটা তাহলে সত্যি?' জানতে চাইল রানা। 'ড. নিমাকে ডিরেক্টর করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'এবার তাহলে আমাদেরকে বিদায় দিন,' বলে মন্ত্রী মহোদয়দের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা।

আবার আকাশে ওঠার পর মেডিটারেনিয়ান কোর্স ধরে সেই উত্তর দিকেই রওনা হলো হারকিউলিস। রানা, মারটিন, ইস্কান্দার আর কালান্দার–চারজনই ককপিটে রয়েছে। দীর্ঘ সবুজ সাপের মত নীলনদ ওদের পাশাপাশি এঁকেবেঁকে পিছন দিকে ছুটছে।

দীর্ঘ যাত্রাপথে খুব কম কথা বলছে ওরা। তিক্ত প্রসঙ্গটা একবার শুধু ইস্কান্দার তুলল। 'এ যাত্রা ফি ছাড়াই কাজ করতে হলো, কি বলেন?'

'আমি ঠিক টাকার লোভে আসিনি,' মন্তব্য করল মারটিন। 'তবে পারিশ্রমিক পেলে ভাল লাগত। বাচ্চাকাচ্চাদের নতুন জুতো দরকার।'

'কেউ চা খাবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওদের কথা যেন শুনতে পায়নি।

'মন্দ হয় না,' বলল ইস্কান্দার। 'আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন পাওনা ষাট হাজার ডলার এক কাপ চা খাইয়ে পরিশোধ করবেন, আমার বলার কিছু নেই।'

গ্যালিতে চলে এল রানা, সবার জন্যে চা বানাল। ককপিটে ফিরে এসে পরিবেশনও করল নিজ হাতে। সবাই আশা করছে কিছু না কিছু বলবে ও। কিন্তু মিশরীয় সীমান্ত পার না হওয়া পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রাখল রানা।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ খুলল, 'ঋণশোধ করিনি, এমন রেকর্ড কি আমার আছে? নেই। যার যা প্রাপ্য সবাই তা পাবে, বোনাস সহ।'

সবাই ওরা কঠিন দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। সবার মনের সন্দেহ প্রকাশ পেল ইস্কান্দারের একটা মাত্র শব্দে। 'কিভাবে?'

'আমাকে একটু সাহায্য করো, মারটিন,' বলল রানা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে কন্ট্রোল কালান্দারের হাতে দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করল ইস্কান্দার। মেইন ডেকে বেরিয়ে এসে ল্যাভেটোরিতে ঢুকল ওরা।

ইস্কান্দার আর মারটিন দোরগোড়া থেকে দেখছে, পকেট থেকে একটা টুল বের করে কেমিকেল টয়লেটের ঢাকনি খুলে ফেলল রানা। স্ক্রুগুলো খুলছে রানা, পিছনে নিঃশব্দে হাসছে ইস্কান্দার। স্ক্রুগুলো গোপন প্যানেলটাকে জায়গা মত বসিয়ে রেখেছে। হারকিউলিস স্মাগলারদের প্লেন, কাজেই কারিগরি ফলিয়ে ভেতর দিকে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। ইস্কান্দার আর কালান্দার শুধু পরিশ্রম করেনি, বাপ-বেটাকে অনেক মাথা খাটিয়ে পরিবর্তনগুলো গোপন রাখারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এরকম গোপন হোল্ড শুধু ল্যাভেটোরিতেই নয়, এঞ্জিন

হাউজিং আর ফিউজিলাজের অন্যান্য অংশেও আছে।

প্যানেল খোলা হতে ভেতরে হাত গলিয়ে একটা জিনিস বের করল রানা। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল ইস্কান্দার। 'মাই গড! কি ওটা?'

'প্রাচীন মিশরের ব্লু ওঅর ক্রাউন,' বলল রানা। মুকুটটা মারটিনের হাতে তুলে দিল ও। 'বাক্সের ওপর রাখো, তবে খুব সাবধানে।'

কমপার্টমেন্টের ভেতর আবার হাত গলাল রানা, আরেকটা মুকুট বের করে আনল। 'আর এটা হলো নেমেস ক্রাউন।' ইস্কান্দারের হাতে ধরিয়ে দিল।

'আর এটা কি? এটা হলো একত্রিত দুই রাজ্যের লাল আর সাদা ক্রাউন। আর এটা? ফারাও মামোসের ডেথ-মাস্ক। এটা? এটাই কিন্তু শেষ নয়–লিপিকার টাইটার মূর্তি।'

প্রত্ন নিদর্শনগুলো ফোল্ড-ডাউন বাক্সে রাখা হলো। ইস্কান্দার আর মারটিন হাঁ করে দেখছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল ইস্কান্দার, 'আমি ভেবে ছিলাম ব্রোঞ্জের কয়েকটা মূর্তি আর কিছু শিলালিপি উদ্ধার করে আনবেন। এ-সব আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না।'

'আপনার কল্পনার মধ্যে আরও অনেক কিছু নেই,' সহাস্যে বলল রানা। 'হোল্ডের ভেতর লম্বা পাঁচটা ক্রেট আছে। তাতে কি আছে, জানেন?'

একটা ঢোক গিলল ইস্কান্দার। 'কি আছে?'

'প্রাচীন রণক্ষেত্রের পাঁচটা মডেল। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার খুদে মূর্তি, সবগুলোই সোনার তৈরি। একেকটার অ্যান্টিকস ভ্যালু···দুঃখিত, আমি জানি না।'

'কিন্তু,' হতভম্ব দেখাচ্ছে মারটিনকে, মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক, 'আসওয়ানে ওরা যে ক্রেটগুলো নামিয়ে নিয়ে গেল, ড. নিমা শোনেননি?'

'শুনেছেন কিনা জানি না,' বলল রানা। 'তবে শুনলেও বাহান্নটা ক্রেট হত। যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল পাঁচটা আমি চটের বস্তায় ভরে লুকিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে তো অন্তত পাঁচটা লম্বা ক্রেট হালকা হয়ে গেছে, মাথায় করে নিয়ে যাবার সময় টের পায়নি ওরা যে ওগুলো খালি?'

'সব মিলিয়ে পাঁচটা নয়, দশটা বাক্স খালি করেছি আমি,' বলল রানা। 'তবে হালকা হতে দিইনি।'

'মানে?'

'টয়লেটের জন্যে এক গ্যালনের প্রচুর কেমিকেল বটল ছিল এখানে, আরও ছিল বিশ-পঁচিশটা স্পেয়ার অক্সিজেন সিলিন্ডার,' বলল রানা। 'ওজন ঠিক রাখার জন্যে ওগুলো ক্রেটে ভরে দিয়েছি।'

মারটিনের হাসি দেখে কে! তবে তার প্রশ্ন শেষ হয়নি এখনও। 'আপনি জানলেন কিভাবে ড. নিমা আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন?'

'আমার জানা উচিত যে ও চোর নয়, ওর ওই কথাটা মিথ্যে ছিল না। নিমা সত্যি সৎ একটা মেয়ে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, সর্ব অর্থে। আমি বলতে চাইছি, আমাদের ঠিক বিপরীত চরিত্র।'

'খোঁচা মেরে বলা হলেও, প্রশংসা করার জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা,' শুকনো

গলায় বলল ইস্কান্দার। 'কিন্তু আপনাকে সন্দিহান করে তোলার জন্যে নিশ্চয়ই আরও কারণ ছিল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল,' তার দিকে ঘুরল রানা। 'প্রথম সন্দেহ জাগে আমরা যখন ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসি, এসেই মিশরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেন নিমা। বুঝতে পারি কিছু একটা করছেন। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হই নিমা যখন রুবির মাধ্যমে আদ্দিসের মিশরীয় দূতাবাসে একটা মেসেজ পাঠালেন। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমাদের রিটার্ন ফ্লাইট সম্পর্কে মিশরের কাউকে সতর্ক করে দিয়েছেন উনি। তারও অনেক আগে ওঁর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারি আমি, ওর চাচার খুনী হিসেবে মন্ত্রী আতাহার আবু কাসিমকে দায়ী বলে মনে করতেন না।'

'কিন্তু আপনি করতেন?'

'ড. নিমার মুখ থেকে ঘটনাটা শোনার পর যে-কোন লোক আবু কাসিমকে সন্দেহ করবে,' বলল রানা। 'নিমা আসলে খুব সরল মেয়ে, প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাস করতে চান না। আবু কাসিম সম্পর্কে ওর মনোভাব জানতাম বলেই বুঝতে পারি, মেসেজ পাঠিয়ে ওই মন্ত্রীকেই সাবধান করে দিয়েছেন। সে যাই হোক, আমার মেসেজ পেয়ে ওদের প্রেসিডেন্ট অ্যাকশন নেয়ায় মামোসের গুপ্তধন রক্ষা পেল।'

'আংশিক,' ফোড়ন কাটল মারটিন।

'আমরা বেশি নিয়েছি, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না,' হেসে উঠে বলল রানা। 'বাহান্নটা বাক্সের মধ্যে আমরা নিয়েছি মাত্র দশটা, বাকি বিয়াল্লিশটা মিশরের ভাগে পড়েছে।'

'আপনার বান্ধবী, ড. নিমা, এই যে আপনার সঙ্গে বেঈমানী করলেন, সেজন্যে আপনার রাগ হচ্ছে না?' জানতে চাইল ইস্কান্দার। 'তাঁর সম্পর্কে এই মুহূর্তে আপনার ধারণা কি? ডাইনী, রাক্ষসী ইত্যাদি বলে গাল দিতে ইচ্ছে করছে না?'

'সাবধান!' আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। 'নিমা মার্জিত, সৎ, দেশপ্রেমিক মেয়ে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে জিভ কাটল ইস্কান্দার, 'মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি!' মারটিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল সে।

প্রাচীন মিশরের মাত্র দুটো মুকুট রাখা হয়েছে পালিশ করা ওয়ালনাট কনফারেন্স টেবিলে। কনফারেন্স রুমটা জুরিখের একটা ফাইভ স্টার হোটেলের দশতলায়। সবগুলো জানালার পর্দা টেনে দিয়েছে রানা, সিলিঙে লুকানো উৎস থেকে আলো পড়ছে মুকুট জোড়ার ওপর। হোটেলটার একটা স্যুইট ভাড়া নিয়েছে রানা, সেই সঙ্গে প্রাইভেট কনফারেন্স রুমটাও।

আমন্ত্রিত অতিথির জন্যে একা অপেক্ষা করার সময় চারদিকে তাকিয়ে প্রস্তুতিতে কোন খুঁত আছে কিনা দেখে নিল রানা, তারপর আয়নার সামনে হেঁটে এসে টাইয়ের নটটা অ্যাডজাস্ট করল। ওর পরনের ডোরাকাটা স্যুটটা সেভাইল রো থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা।

কোমল শব্দে ইন্টারকম বেজে উঠল। হ্যান্ডসেট তুলল রানা।

'ফ্রেড ম্যাকমোহন, আপনার অতিথি, নিচের লবিতে পৌঁছেছেন, মি. রানা।'

'প্লীজ, ভদ্রলোককে ওপরে পাঠিয়ে দিন,' বলল রানা।

কলিংবেল বাজতেই কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে দিল ও। দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রেড ম্যাকমোহন। 'মি. রানা,' বললেন তিনি, 'আশা করি আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন না। আপনার মেসেজ পেয়ে ব্যক্তিগত প্লেন নিয়ে সেই টেক্সাস থেকে ছুটে আসতে হয়েছে আমাকে।' রানা তাঁকে টেলিফোন করেছিল ত্রিশ ঘণ্টা আগে। এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার অর্থ হলো, ফোন পেয়েই প্লেনে চড়ে বসেন ভদ্রলোক।

'ভেতরে আসুন, মি. ম্যাকমোহন,' সহাস্যে বলল রানা। 'বলুন কি খাবেন।'

'এ-সব প্যাঁচাল বাদ দিন তো,' ভেতরে ঢুকে বললেন ম্যাকমোহন। 'আগে বলুন কি দেখাতে চান।' তাঁর পিছু নিয়ে আরও দুই ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন, দু'জনকেই চেনে রানা।

দরজা বন্ধ করে কনফারেন্স টেবিলের দিকে তাকাল রানা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ধনকুবের ফ্রেড ম্যাকমোহনের বয়েস সত্তর হলেও, দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। পাকানো, তেল চকচকে খুঁটির মত কাঠামো। ফর্বস ম্যাগাজিন-এর ধনকুবেরদের তালিকায় সাত নম্বরে আছেন তিনি, বলা হয়েছে এক দশমিক সাত বিলিয়ন নগদ মার্কিন ডলারের মালিক ভদ্রলোক।

অ্যান্টিকুয়ারিয়ান জগৎটা খুব ছোটই বলতে হবে, এই জগতে অল্প কিছু লোক চলাফেরা করেন, কাজেই তাঁদের প্রায় সবাইকেই চেনে রানা। ম্যাকমোহনের একজন সঙ্গী ডালাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, প্রাচীন ইতিহাস পড়ান। ওই ভার্সিটিতে নিয়মিত চাঁদা দেন ম্যাকমোহন। অপর ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে নাম করা ও শ্রদ্ধেয় আন্টিকস ডিলার।

ম্যাকমোহন অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, ফলে পিছনের ওঁরা দু'জন তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, যদিও ম্যাকমোহন তা খেয়ালই করলেন না। 'এ আমি কি দেখছি?' বিড়বিড় করলেন তিনি, তারপর রানার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন, 'এগুলো কি নকল?'

প্রথমে কিছু না বলে হাসল রানা। তারপর বলল, 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

এরপর কনফারেন্স টেবিলের দিকে পা টিপে টিপে এগোলেন ম্যাকমোহন, যেন ভয় পাচ্ছেন দ্রুত হাঁটলে চোখের সামনে থেকে মুকুট দুটো গায়েব হয়ে যাবে। 'এগুলো একদম নতুন,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'তা না হলে অন্তত অস্তিত্ব সম্পর্কে খবর পেতাম।'

'বলতে পারেন সদ্য মাটির নিচে থেকে তোলা হয়েছে,' বলল রানা। 'আপনিই প্রথম দেখছেন।'

'মামোস!' নেমেস ক্রাউনে খোদাই করা লিপির ওপর চোখ বুলালেন ম্যাকমোহন। 'গুজবটা তাহলে মিথ্যে নয়! আপনি নতুন একটা সমাধি খুলেছেন।'

'প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো একটা সমাধিকে আপনি যদি নতুন বলেন,

আমার আপত্তি নেই।'

ম্যাকমোহন আর তাঁর উপদেষ্টারা টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কারও মুখে কথা নেই, সবার চোখ চকচক করছে।

'শুধু আমরা নিজেরা এখানে থাকব–কিছুক্ষণ,' বললেন ম্যাকমোহন, রানাকে সরে যেতে বলছেন। 'কথা বলার সময় হলে আপনাকে ডাকব আমি। প্লীজ!'

এক ঘণ্টা পর আবার কনফারেন্স রূমে ফিরে এল রানা। তিন ভদ্রলোক টেবিলের তিন দিকে এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন, যেন মুকুট দুটোর অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিণত হয়েছেন তাঁরা। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ম্যাকমোহন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কনফারেন্স রূম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমোহন কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন, 'কত?'

'পনেরো মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' জবাব দিল রানা।

'তার মানে প্রতিটি সাড়ে সাত মিলিয়ন।'

'না, প্রতিটি পনেরো মিলিয়ন। দুটো ত্রিশ মিলিয়ন।'

ম্যাকমোহন এমন ভাবে দুলে উঠলেন, মনে হলো চেয়ার থেকে সরে যাবেন। 'আপনি পাগল, না অন্য কিছু?'

জবাব না দিয়ে রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল রানা।

'আসুন পার্থক্য কমিয়ে আনি,' বললেন ম্যাকমোহন। 'সাড়ে বাইশ মিলিয়ন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এক দর।'

'এ আপনার সাংঘাতিক অন্যায়, মি. রানা! আপনি ডাকাতি করতে চাইছেন।'

এবারও উত্তর না দিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। তারপর ছোট্ট করে বলল, 'দুঃখিত।'

চেয়ার ছাড়লেন ম্যাকমোহন। 'দুঃখিত আমিও। ঠিক আছে, আমি তাহলে গেলাম। পরে হয়তো আপনার সঙ্গে দরে বনবে, নতুন কিছু পেলে আমাকে খবর পাঠাবেন।'

পিছনে হাত বেঁধে দরজার দিকে এগোলেন তিনি। দরজাটা খুলছেন, পিছন থেকে ডাকল রানা, 'মি. ম্যাকমোহন!'

ব্যগ্রভঙ্গিতে ওর দিকে ঘুরলেন ম্যাকমোহন। 'ইয়েস?'

'পরের বার আপনি আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন, আর আমি আপনাকে শুধু ফ্রেড বলে, ঠিক আছে? আমরা তো পুরানো বন্ধুই, তাই না?'

'শুধু এটুকুই বলার আছে আপনার?'

'হ্যাঁ। আর কি?' রানাকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

'আপনি আমাকে টরচার করছেন,' অভিযোগ করলেন ম্যাকমোহন, ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়লেন। 'আপনি নরকে পচবেন।'

রানা কথা বলছে না।

'ঠিক আছে, টাকাটা আপনি কিভাবে চান?'

'দুটো ব্যাংক ড্রাফটে, প্রতিটি পনেরো মিলিয়ন ডলার।'

ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন ম্যাকমোহন, নিজের অ্যাকাউন্ট্যান্টকে

ডাকবেন। বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এক মিনিট, মি. ম্যাকমোহন। আপনাকে দেখাবার মত আরও দু'একটা জিনিস আছে এখানে।' টেবিল থেকে নিজের ব্রীফকেসটা টেনে নিল ও, তালা খুলে ভেতর থেকে খুদে কয়েকটা সোনার মূর্তি বের করল। মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে সৈনিক, রথ, সেবিকা, ঘোড়সওয়ার ও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র।

'এগুলো কি?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ম্যাকমোহন। 'এ-সব তো আমি জীবনে কখনও দেখিনি!'

'দেখেননি বলেই তো দেখাচ্ছি।' হাসছে রানা।

সৈনিকের মূর্তিটা হাতে নিলেন ম্যাকমোহন। নেড়েচেড়ে দেখছেন। হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। মামোসের সীল! সীলের ওপর খোদাই করা ফারাও-এর প্রতিকৃতি! ওহ্ গড! মি. রানা, জেনুইন তো?'

'ব্রোঞ্জের সীলই প্রমাণ করে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, যাচাই না করে আপনি কিনবেন কেন? যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এগুলো কেনার সামর্থ্য সত্যি আপনার হবে কিনা।'

'মানে? কি বলতে চান আপনি?'

'পরে কথা হবে,' বলল রানা। 'আগে আপনি আপনার উপদেষ্টাদের ডেকে দেখান। মনে সন্দেহ রেখে দর করা চলে না।'

আবার সঙ্গী ভদ্রলোক দু'জনকে কনফারেন্স রূমে ডেকে পাঠালেন ম্যাকমোহন। দীর্ঘ সময় নিয়ে মূর্তিগুলো পরীক্ষা করলেন তাঁরা। দু'জন প্রায় একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, তাকিয়ে আছেন ম্যাকমোহনের দিকে। ম্যাকমোহন চোখ ইশারায় বিদায় করে দিলেন তাঁদের।

'কত?' দরজা বন্ধ হতেই রানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'এখানে আমি একটু ভূমিকা করতে চাই,' বলল রানা। 'আমাদের দেশে সাতশো বছরের পুরানো কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ বিক্রি হয় ত্রিশ লাখ টাকায়। আর এই মূর্তিগুলো সোনার, প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো। একেকটা মূর্তির দাম কি হতে পারে আমি তা শুধু আপনাকে আন্দাজ করতে বলছি।'

'আপনি আমাকে অপমান করেছেন,' গম্ভীর সুরে বললেন ম্যাকমোহন। 'আপনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলতে চাইছেন এগুলোর দাম এত বেশি হাঁকবেন যে আমার কেনার সামর্থ্য হবে না!'

রানা হাসল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি সে অর্থে বলিনি। একটু পরে ব্যাখ্যা করছি। তার আগে প্রতিটি আইটেমের দাম আন্দাজ করুন, প্লীজ।'

'আমি কেন আন্দাজ করতে যাব!' রেগে উঠলেন ম্যাকমোহন। 'আপনার জিনিস আপনি দাম বলবেন।'

'এক দর,' বলল রানা। 'প্রতিটি এক লাখ মার্কিন ডলার। বলতে পারেন, পানির দর।'

'এই দরে অবশ্যই আমি কিনব না,' সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ম্যাকমোহন। 'তবে আমার কেনার সামর্থ্য নেই, আপনার এই মনোভাবের ব্যাখ্যা চাই আমি।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি।

'দিচ্ছি ব্যাখ্যা,' বলল রানা। 'তার আগে বলে রাখি, আপনার সামর্থ্যকে ছোট করে দেখার মত বোকা আমি নই। ব্যাখ্যাটা হলো, এগুলো একটা সাজানো যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল থেকে তুলে আনা হয়েছে। মডেলের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, মি. ম্যাকমোহন।'

'মডেল? যুদ্ধক্ষেত্রের মডেল? ফারাও মামোসের যুদ্ধক্ষেত্র?' ম্যাকমোহন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

'হ্যাঁ।'

'মডেলটায় এরকম আইটেম সব মিলিয়ে ক'টা?' রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ম্যাকমোহন।

'ছয় হাজার,' বলে তৈরি হয়ে গেল রানা, ম্যাকমোহন পড়ে যাবার উপক্রম করলে ধরে ফেলবে।

'ছয় হাজার!' গলার স্বর শুনে মনে হলো ম্যাকমোহন শুধু পুনরাবৃত্তিই করলেন, শব্দ দুটোর অর্থ তাঁর বোধগম্য হয়নি। 'ছয় হাজার মানে?'

'মানে ছয় হাজার আইটেম।'

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!'

'আপনার শরীর খারাপ লাগছে না তো, মি. ম্যাকমোহন?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'কারণ, এখনও সব কথা আমি বলিনি।'

'এখনও সব কথা বলেননি! এখনও সব কথা বলেননি?'

'না। এরকম মডেল সব মিলিয়ে পাঁচটা।' এবার এগিয়ে এসে ম্যাকমোহনের কাঁধে হাত রাখল রানা, দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

'পানি...পানি...' বিড়বিড় করলেন ম্যাকমোহন। 'না... খানিকটা ব্র্যান্ডি হলে ভাল হয়...'

'আনিয়ে রেখেছি,' বলে টেবিল থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে একটা গ্লাসে খানিকটা ঢালল রানা, গ্লাসটা ধরিয়ে দিল অতিথির হাতে।

ব্র্যান্ডিটুকু এক ঢোকে গলাধঃকরণ করলেন, ম্যাকমোহন। 'আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন, প্লীজ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল রানা, কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল।

ঝাড়া বিশ মিনিট নড়লেন না ম্যাকমোহন। তাঁর মস্তিষ্কে হিসাব চলছে, ওটাকে সবাই কমপিউটর হিসেবেই জানে। তারপর তিনি মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. রানা। এত টাকা খরচ করার সামর্থ্য সত্যি আমার নেই।' পরক্ষণে দ্রুতবেগে মাথা নাড়লেন। 'না, ভুল হলো। সামর্থ্য আমার আছে, কিন্তু এত টাকা আপনাকে আমি দেব না।' রানার চেহারায় আড়ষ্ট ভাব লক্ষ করে আবার বললেন, 'আমি কি প্রলাপ বকছি?'

'আমার মনে হয় আপনি মুকুট জোড়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই ভাল করবেন,' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আমার আরও দু'জন খদ্দের আছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন।'

'না!' প্রায় গর্জে উঠলেন ম্যাকমোহন। 'এ-সব আমি কাউকে ছুঁতে দেব না! না, অসম্ভব!'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' সবিনয়ে বলল রানা। 'এ-সব মানে? আপনি কি একটা মডেলের সবগুলো আইটেম নিতে চাইছেন? পুরো ছয় হাজারই?'

'না!' হিসহিস করে বললেন ম্যাকমোহন। 'পাঁচটা মডেলই আমার চাই!'

'ওহ্ গড!' স্তম্ভিত দেখাল রানাকে। 'সে তো অনেক দাম, মি. ম্যাকমোহন!'

'আমি কি সর্বহারা?' কোন সাহসে আপনি আমাকে দামের ভয় দেখান?' ঠকঠক করে কাঁপছেন ম্যাকমোহন, রাগে না উত্তেজনায় বলা কঠিন। 'তবে আপনার এই ডাকাতি করার প্রবণতা আমি মেনে নেব না। দাম হয়, প্রতিটি আইটেম যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার ধরি...'

'এক লাখ ডলার,' শুধরে দিল রানা।

'না। ঠিক আছে, সত্তর হাজার ডলার।'

'এক দর, মি. ম্যাকমোহন।'

'এ আপনার অসম্ভব দাবি, মি. রানা!' মারমুখো হয়ে রানার দিকে এক পা এগোলেন তিনি। 'কেনা-বেচায় দরদাম হয়ই। আপনি এভাবে গোঁ ধরে থাকলে...'

'বাংলাদেশী টাকায় হিসাবটা বুঝতে আমার সুবিধে হয়,' বলল রানা। 'আপনি যদি ত্রিশ হাজার আইটেমই নেন, কিছুটা ছাড় দেয়া যেতে পারে। আমার হিসেবে দাম হয় বারো হাজার ছয়শো কোটি টাকা।'

'আমি আট হাজার কোটি টাকা দেব। প্লীজ, মি. রানা, এর বেশি দিতে হলে আমি ফকির হয়ে যাব।' ভাব দেখে মনে হচ্ছে রানার কাছে যেন ভিক্ষা চাইছেন ম্যাকমোহন।

'এক হাজার কোটি টাকা,' বলল রানা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে হ্যাঁ বলুন, তা না হলে বিদায় হোন।'

চেয়ারে বসে ধুঁকতে লাগলেন ম্যাকমোহন। গত পনেরো মিনিটে তাঁর বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ঠিক এক মিনিটের মাথায় মুখ তুললেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডাকি?'

এক গাল হেসে রানা বলল, 'শুভ কাজে দেরি কিসের!'

লন্ডন, রানার নিজের ফ্ল্যাট। স্টাডিরুমের ডেস্কে বসে সামনের দেয়াল ঢাকা প্যানেলিং-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। ডেস্কের তলায় হাত গলিয়ে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল-এর গোপন বোতামে চাপ দিল, প্যানেলের একটা অংশ নিঃশব্দে সরে গেল একপাশে, বেরিয়ে পড়ল ডিসপ্লে কেবিনেটের আর্মারড প্লেট গ্লাস। একই সঙ্গে আপনা থেকে জ্বলে উঠল সিলিঙের স্পটলাইট, চোখ ধাঁধানো রশ্মিগুলো পড়ল কেবিনেটে রাখা জিনিসগুলোর ওপর। ফারাও মামোসের ডেথ-মাস্ক আর ডাবল ক্রাউনের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো কি যেন নেই ওখানে। তারপর ডেস্ক থেকে টাইটার মূর্তিটা তুলে নিল ও, মুখের সামনে ধরে এমন সুরে কথা বলল, যেন নিজের সঙ্গেই আলাপ করছে। 'নিঃসঙ্গতা কি জিনিস, তুমি তা ভালই

বোঝো, তাই না? এ-ও বোঝো যে কাউকে ভালবেসে না পাওয়াটা কি যন্ত্রণাময় একটা অভিজ্ঞতা!'

স্ট্যাচুটা রেখে দিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল রানা, আর ঠিক তখনই ওটা বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। দু'বার রিঙ হলো, তারপর আরেকবার।

রিসিভার তুলল রানা। নিমাকে ফোন করতে যাচ্ছিল ও, অথচ বাধা পড়ল। 'হ্যালো?'

'রানা? রানা, আপনি?'

'ওহ্ গড! নিমা? আপনি?' নিমার গলা শুনে রানার শিরদাঁড়া বেয়ে রোমাঞ্চকর একটা শিহরণ নেমে এল।

'হ্যাঁ, আমি। ভেবেছিলাম আমার গলা পেয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখবেন আপনি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল নিমা।

'কেন, না! আমিই তো আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'সত্যি?' উল্লসিত মনে হলো নিমাকে। 'কেন?'

'ডিরেক্টর হয়েছেন, কংগ্রাচুলেট করার জন্যে।'

'আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন,' বলল নিমা। 'দশটা ক্রেট কম পেয়েছি আমরা।'

'জ্ঞানী এক লোক যেমন বলেছিল একবার, বন্ধুদের ঠকানো সবচেয়ে সহজ–ওরা বেঈমানী আশা করে না। আপনিও করেননি, আমিও না। কথাটার সত্যতা আপনার অন্তত বোঝা উচিত, নিমা।'

তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকল নিমা। 'আপনি ওগুলো বিক্রি করেছেন, শুনেছি আমি। কানে এল শুধু মুকুটগুলোর জন্যেই ফ্রেড ম্যাকমোহন বিশ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন।'

'ত্রিশ মিলিয়ন,' শুধরে নিল রানা। 'তবে শুধু নীল আর নেমেস মুকুটের বিনিময়ে। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে লাল আর সাদা ক্রাউন সহ ডেথ-মাস্ক কেবিনেটে সাজানো রয়েছে।'

'সব আপনি একা নেবেন, কাউকে ভাগ দেবেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'মডেল পাঁচটার কথা তুলছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওগুলো আপনি বিক্রি করবেন না, আমি জানি,' বলল নিমা। 'আমি যেমন চেয়েছিলাম উদ্ধার করা গুপ্তধন কায়রো মিউজিয়ামে থাকবে, আপনিও নিশ্চয়ই চেয়েছেন ওগুলো বাংলাদেশের মিউজিয়ামে থাকবে।'

'না, আমি তা চাইনি,' বলল রানা, একটু ম্লান সুরে। 'আমরা খুবই গরীব, আমাদের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কাজেই মিউজিয়ামের শোভা বাড়ানোর বিলাসিতা আমাদের সাজে না। নগদ টাকাই বরং বেশি দরকার।'

'তারমানে কি মডেলগুলোও আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'এক হাজার কোটি টাকায়।'

'ওহ গড!'

কয়েক মুহূর্ত আর কোন কথা হলো না। তারপর নিমা জানতে চাইল, 'সব টাকা আপনি সরকারী কোষাগারে জমা দিচ্ছেন?'

'না,' বলল রানা। 'পাওনা শোধ করতে কিছু টাকা বেরিয়ে গেছে।'

'পাওনা মানে?'

'অ্যালান্ শাফি আর রুবিকে দিয়েছি পনেরো মিলিয়ন ডলার,' বলল রানা। 'বাকি সবার পাওনা মেটাতে আরও পনেরো মিলিয়ন ডলার বেরিয়ে গেছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল নিমা।

'কেন ফোন করেছেন বলুন, আমিও খুশি হই।' রানা হাসছে।

'কেমন আছেন আপনি? খুব জানতে ইচ্ছে করে, আমার ওপর এখনও রাগ করে আছেন কিনা।'

'কারও ওপর কোনও রাগ নেই আমার,' বলল রানা। 'দু'জনেই আমরা দু'জনকে ঠকাবার চেষ্টা করেছি, তবে ব্যক্তিস্বার্থে নয়। রাগ হওয়া তো দূরের কথা, আপনার নীতিবোধের প্রশংসা করি আমি।'

তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই, 'শুধু এই কথা জানার জন্যে ফোন করেছেন, আমি রাগ করে আছি কিনা?'

'না।'

'তাহলে?'

প্রায় তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর নিমা বলল, 'আমি জানতে চাই, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?' রানার দম আটকানোর আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল নিমা।

খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এরকম একটা, আপনারই ভাষায়, অসম্ভব কথা কেন আপনি ভাবছেন?'

'কারণ আমি উপলব্ধি করেছি আপনাকে আমি ভালবাসি,' জবাব দিল নিমা। 'আপনার কাছে এমন কিছু পেয়েছি··· যেটা···মানে···'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'না, নিমা। কাজটা উচিত হবে না।'

'উচিত হবে না? কেন?' উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল শোনাল নিমার গলা। 'আমাকে আপনার ভাল লাগে না?'

'লাগে, অসম্ভব ভাল লাগে,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আমি মানুষটা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে টাইপের, নিমা। তাছাড়া, আমার পেশা আমাকে কোথাও স্থির হয়ে বসতে দেয় না। এমন একটা দুর্ভাগা দেশে জন্মেছি, দেশের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে না পারলে পাপ হবে বলে মনে হয়। ঘরবাঁধা আমার হবে না কোনদিন।'

অপরপ্রান্তে নিমা কথা বলছে না।

এদিকে রানাও চুপ করে আছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমাই, 'আপনি মহৎপ্রাণ মানুষ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'আমি কি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি, কেন আমাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'আপনার ব্যাখ্যা চিরকাল আমাকে অনুপ্রাণিত করবে,' বলল নিমা। 'কিন্তু আপনার সিদ্ধান্ত আজীবন কষ্ট দেবে। তবু আমি মেনে নিলাম।'

কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল রানা। অনেকক্ষণ পর শুধু বলল, 'ধন্যবাদ, নিমা।'

'তবু, একবার কি দেখা হতে পারে না?' গলা শুনে বোঝা গেল কান্না চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে নিমা।

'কেন পারে না, আপনি বললেই কায়রোয় পৌঁছে যাব আমি।'

'আসবেন? সত্যি আসবেন? কাল বিকেলে একটা ফ্লাইট আছে।'

'এয়ারপোর্টে আপনি আমাকে নিতে আসবেন তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল নিমা। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'জানেন, আতাহার আবু কাসিমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে? কোর্টে উনি স্বীকার করেছেন যে আমাকে মেরে ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।'

'শুনেছি,' বলল রানা। 'আপনি কি জানেন, ইথিওপিয়া সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে শাফি? যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করেছে ও। জেনারেল ইলেকশনে অংশ নেবে। কেয়ারটেকার সরকার গঠন করা হয়েছে, ওকে দেয়া হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব। কেয়ারটেকার সরকারে রুবিকেও রাখা হয়েছে, কালচারাল মিনিস্টার হিসেবে।'

'কি বলছেন!'

'আরও শুনবেন? রুবিও আগামী ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে...'

'সব কথা এভাবে বলে ফেললে তো মুশকিল। কায়রোয় এসে কি করবেন?'

'কায়রোয় আমি আপনাকে দেখব, দু'চোখ ভরে। বিয়ে না করতে পারি, প্রেম করতে অসুবিধে কি?' হেসে উঠল রানা।

'ভুলে গেছেন, আমি আরবী মেয়ে? ও-সব প্রেম-ট্রেম হবে-টবে না। আমরা শুধু পরস্পরের বন্ধু হতে পারি, রানা।'

'জানি, এবং আপনার এই মনোভাবকেও আমি শ্রদ্ধা করি,' বলল রানা। 'কথা দিচ্ছি, চেষ্টা করব, আমি যেন আমাদের এই মধুর বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে পারি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা,' বলল নিমা। ওর হাঁফ ছাড়ার আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল রানা। 'আপনি বাঁচালেন আমাকে!'

* * *